Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Papiya Publishers; No. 49, Cornwallis Street, Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Nripendrakumar Basu
Title: *Nari bipathe jay keno* (2nd part)	Year of Publication: *Kartwik*, 1355 B.S. **1948**
	Size: 18 c.m. x 12 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979) and Aradhana Devi	Condition: Good.
	Remarks: Soft bound. Total pages: 166; Title page and content list are not included in numbered pages. Aradhana Devi is not anybody's personal name. The author has been benefited by numerous informations from number of women and acknowledged them totally in the self-created name of Aradhana Devi.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

এই গ্রন্থ জনৈক রাখি :—
আরাধনা দেবী একজন রক্তমাংস-
ময়ী বিশেষ নারী নহেন ; যে-
সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নারী
নারী আমার পুস্তকগুলি
লেখার ব্যাপারে নিজেদের
প্রেম-জীবনের ও অপর
পরিচিত জনের অসাধারণ
ফলগত রুচি ও ব্যবহার
সম্বন্ধে নানা অভিনব তথ্য
সংবেদন পাঠাইয়া সাহায্য
করিয়াছেন তাঁদেরই মিলিত
ভাবমূর্তির নাম আরা-
ধনা দেবী। আমি
অন্যদিকে মনী
দেবীও

নারী বিপথে যায় কেন

(২য় পর্ব)

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

ও

শ্রীমতী আরাধনা দেবী

প্রকাশস্থান
পাপিয়া পাবলিশার্স
৪৯, কর্নোআলিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রধান প্রাপ্তিস্থান
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩, কর্নোআলিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ম সংস্করণ]

[মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র

ওগো প্রেমিক পিতা ও মাতা
দাম্পত্য সুখ, গর্ভ, প্রসববিজ্ঞান ও সন্তানপালন ৩৲
যৌন বিশ্বকোষ
তিন খণ্ডে সমাপ্ত স্বনামখ্যাত গ্রন্থ ৩৲
প্রেম ও কামবিজ্ঞান
উচ্চতর প্রেমরসপিপাসুর গোমুখী ৩৲
ফ্রএডের ভালবাসা ৪৲
ফ্রএডের নারীচরিত্র ৪৲

শ্রীরামকৃষ্ণ পান কর্তৃক কলিকাতা ২০৯নং কর্নোয়ালিস্
ষ্ট্রীটস্থ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

ঃঃ পর্বান্তর-প্রারম্ভে ঃঃ

চারি বৎসরের কিছু অধিক কাল পূর্বে "নারী বিপথে যায় কেন" বইয়ের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হইয়া, মাস দশেকের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। তখন ভূমিকায় ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার উপকারিতা স্বীকার করিলে ও এ সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য জানিতে আগ্রহশীল হইলে তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করিব। তদবধি পাঠকপাঠিকাদিগের অনেকেই আমাকে ২য় পর্ব লিখিয়া প্রকাশ করিবার ঐকান্তিক ও উপর্যুপরি তাগাদা দিলেও এতদিন উহা আমার পক্ষে নানা কারণে বাহির করা সম্ভবপর হয় নাই। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হইল—কাগজের শোচনীয় অপ্রতুলতা, আমার অসুস্থতা ও কর্মান্তর-ব্যাপৃতি। কালাবাজারে কাগজের অভাব ছিল না, আজিও নাই; কিন্তু কালামুখ লইয়া সে-মুখো হইবার দুষ্প্রবৃত্তি আমার কখনো হয় না।

এ পুস্তক সকলের জন্য নয়—বিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য, তাহা বাহিরে ও ভিতরে একাধিক বার জানাইয়া দিতেছি। যাঁহারা ইতঃপূর্বে নৃপেন বোসের কোন বইয়ের স্বাদ লন নাই অথবা যাঁহারা প্রথম পর্ব পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে এ পুস্তক-পাঠ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করি। আরো বলি, ঝুনো নীতিবাদী, স্নেহ-শ্রদ্ধা-মমতা-শূন্য, উন্নাসিক সমালোচককুলের নিক্তির উপরে অথবা নীল চশমার তলায় রাখিবার জন্যও এ বই নয়।

কাহারো এতৎসম্পর্কে কিছু বক্তব্য থাকিলে অথবা কোন শিক্ষণীয় বা স্মরণীয় ঘটনার কথা জানা থাকিলে দয়া করিয়া লিখিয়া জানাইবেন। চিঠির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর যাঁহারা অতি-বিলম্বে প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাকে ॥/১০র ডাকটিকিট পাঠাইয়া দেন। চিঠি, দিঠি, পঠন, লিখন ও অকালবার্ধক্যের ভারে আমি দিবারাত্র বিব্রত। ইতি।

কলিকাতা, ৩০শে কার্ত্তিক, '৫৫। শ্রী নৃ. কু. বসু।

প্রধান বিষয়সূচী

প্রথম।	প্ররোচক-পদে শিক্ষক	...	...	১
দ্বিতীয়।	ওস্তাদের মার	....	....	১৯
তৃতীয়।	ঘরে-বাইরে শিক্ষক ও হোস্টেল		....	৪৭
চতুর্থ।	পিতামাতার দায়িত্ব	....	....	৬৬
পঞ্চম।	শ্যালিকা ও ভগিনীপতি	...	....	৯০
ষষ্ঠ।	সহবাসী ও প্রতিবেশী	....	....	১২০
সপ্তম।	আত্মীয়স্বজনের পাশবিকতা	....	...	১৫৫

[প্রত্যেকটি বিষয় বহু উপবিষয়ে বিভক্ত ও প্রত্যেকটি বক্তব্য একাধিক সত্য ঘটনার বিবৃতি-দ্বারা আলোকিত।]

নারী বিপথে যায় কেন

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম আলোচনা

প্ররোচক-পদে শিক্ষক

নারী প্রথমে প্ররোচিত হয়, তারপর সে প্ররোচিত করে। অর্থাৎ এক বা একাধিক পুরুষ সর্বপ্রথম নারীকে বিপথ গমনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে; তারপর নারী গুরুর আসনে বসিয়া এক বা একাধিক পুরুষকে পাপের পথে টানিয়া আনে। নারীর কুশিক্ষার গুরু ঘরে-বাইরে চতুর্দিকে ছড়াইয়া আছে নানা বেশে ও ছদ্মবেশে। তাহাদিগকে চেনা মুস্কিল এবং চিনিতে পারিলেও সকল ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া মুস্কিল। বহুক্ষেত্রে অপরাধী ধরা পড়ে ক্ষতিসাধনের পর। ক্ষতিসাধনের প্রারম্ভে ধরা পড়িলে, বহু স্থলে অপরাধীকে দূরে রাখা বা দূরীভূত করা সম্ভবপর হয়।

ঘরের কুমির

যে নদীতে কুমির আছে, সে নদীকে স্নানের পক্ষে মারাত্মক জানিয়া সকলেই এড়াইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ঘরের ঢেঁকি হঠাৎ একদিন যখন কুমির হইয়া ল্যাজের ঝাপ্‌টা মারে, তখন তাহাকে মানুষ সাম্‌লাইতে পারে না। সাধারণ লোকের ধারণা যে, মেয়েরা পথে বাহির হইলেই পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাকে আমন্ত্রণ

করে। কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকিয়াও মেয়েরা যে পাপকার্যে দীক্ষিত হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বে কিছু পাইয়াছি; অতঃপর আরো কিছু পাইব। দাসদাসী, পাচকপাচিকা, মোটরচালক, দারোয়ান, গোমস্তা দ্বারা শুধু বাটীর ছেলেমেয়েরাই যে কামচর্চার ভাবগত ও বস্তুগত জ্ঞানে পরিপক্ক হয়—তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে বিবাহিতা ও বিধবা নারীগণ তাহাদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, অথবা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নিজেদের পাপবাসনা মিটাইতে থাকে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ি না হইলে প্রায়ই চাপা থাকে শেষ পর্যন্ত। বৃহৎ সংসারে অচিরে এ ব্যাপার কাহারো-না-কাহারো চোখে একদিন পড়িয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে শুধু অপরাধীটি বাড়ি হইতে বিতাড়িত হয়, কোন ক্ষেত্রে অপরাধিনীটিকে পিত্রালয়ে বা অন্য কোথাও নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। এমন অনেক কেস দেখিয়াছি যেখানে ভৃত্য, গোমস্তা বা পাচকের সহিত ভদ্রঘরের—এমন কি অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ঘরের রূপসী কন্যা বা কুলবধূ পলায়ন করিয়াছে।

কুরুচি ও মর্যাদাবোধ

অতি কুৎসিত দরিদ্র অথবা হীন দুষ্কৃতের প্রতি ধনী পরিবারের সুরূপা সুশীলা নারীর আসক্তি জন্মিতে পারে কিরূপে—এ প্রশ্নের উত্তর খানিকটা এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে দিয়াছি; আর বাকিটা দিয়াছি আমার "প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান" ও "ফ্রএডের নারীচরিত্র" নামক বই দুইখানিতে। পূর্বালোচিত বিষয়ের এখানে আর পুনরুল্লেখ করিব না। উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর আমরা ইতঃপূর্বে দিয়াছি, প্রায় অনুরূপ উত্তরই দেওয়া চলে সেই সকল ক্ষেত্রে—যেখানে একটি সুঠাম সুন্দর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক একজন অতি কুশ্রী দাসীজাতীয় বিগত-যৌবনাকে বা নিম্নশ্রেণীর তরুণীকে সর্বস্ব পণ করিয়া ভালবাসে।

ভদ্রবংশীয় বালক ও বালিকার সম্ভ্রমবোধ বা সামাজিক মর্যাদার অনুভব একদিনে পরিপুষ্ট হয় না; এ বোধ প্রাণের ভিতর শিকড় গাড়িতে যথেষ্ট দেরি লাগে। যাহারা বাল্যকাল হইতে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ অপেক্ষা দাসদাসী ও নিম্নজাতীয় লোকের সঙ্গ বেশী করিয়া লাভ করে, তাহারা যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে সমাজের উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া ও শিক্ষাদীক্ষায় বড় হইয়াও আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদা-বোধকে মনেপ্রাণে বরণ করিয়া লইতে পারে না। তাহারা সমাজের মধ্যে যে শালীনতা ও সম্ভ্রমের আলখাল্লা পরিয়া ঘোরাফেরা করে, সমাজের বাহিরে আসিয়া তাহাকে খানিকক্ষণের জন্য ছাড়িতে না পারিলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠে।

তারপর, পূর্বেই বলিয়াছি যে, কামবীজ শিশু আপন রক্তের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে; তাহার মুখ্যত ভাবগতভাবে ও গৌণত বস্তুগতভাবে কামজীবন আরম্ভ হয় মাতৃক্রোড় হইতে। তাহার বস্তুগত কামচর্চাটা থাকে অনির্দিষ্ট ও অনেকখানি অসংজ্ঞাত। দুই-তিন বৎসর বয়সের পুরুষ-শিশু বা স্ত্রী-শিশু আত্মরতি করিতে আপনা-আপনি প্রবৃত্ত হইতে পারে। এরূপ ঘটনা সর্বদেশে ঘটিতে দেখা যায়। যে সকল শিশু আত্মরতি করে, তাহাদের মনে সে বয়সে কোন পাপবোধ জন্মিতে পারে না; তাহারা এ চর্চাকে একটা দোষাবহ আচার বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু এমন একটা বয়স আসে, যে সময়ে তাহার কামপ্রবৃত্তি উগ্রতা লাভ করে—বিকাশের একটা নির্দিষ্ট শৈলীর সন্ধান করে—পরিতৃপ্তির বস্তু বা উপাদান খুঁজিবার ব্যগ্রতা আসিয়া তাহার বুকে বাসা বাঁধে। তখন কামের মধ্যে প্রচুর কৌতূহল গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। কামচর্চা বা কাম সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পথে সামাজিক ও পারিবারিক শাসনানুশাসন রক্তচক্ষু মেলিয়া বসিয়া আছে—

বালকবালিকা কিশোরকিশোরীরা তাহা দেখিতে পায়। তখন হইতে তহার মনে গূঢ়তারক্ষার ঈপ্সা—কামজ অপরাধ-বোধ দানা বাঁধিতে থাকে!

প্রথম দীক্ষাগুরু

এই কৌতূহলকে সর্বপ্রথম মিটায় যে, তাহার তথ্যগত ও ক্রিয়াগত জ্ঞানলাভে সকলের আগে সহায়তা করে যে, তরলমতি তরুণ তাহাকে গুরুরূপে সানন্দে বরণ করে। শুধু গুরুরূপে নয়—প্রায় প্রেমিকরূপেও। সমরতি বা বিষমরতিতে প্রথম দীক্ষাদাতাকে পরবর্তীকালে বালক যদি-বা সহজে ভুলে, কিন্তু বালিকা ভুলে না। প্রথম-প্রেমিকের ছবি অনেক নারীর উত্তরকালীন সত্যকার প্রেমনিষিক্ত জীবনকে বিষাক্ত ও কণ্টকিত করিয়া দেয়। আদ্য প্রেমিকের ছবি যদি-বা কাহারো স্মৃতি হইতে কালক্রমে মুছিয়া যায়, আদ্য প্রেমানন্দের অনুভূতি তাহার স্মৃতিতে চিরঞ্জীব হইয়া থাকে। সেই অনুভূতির কষ্টি-পাথর দিয়া সে বার বার পরবর্তী-বয়সে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে পরখ করিতে এবং পুরাতন ভালবাসার নিক্তিতে নূতন আস্বাদনের গুরুত্ব-লঘুত্ব নির্ণয় করিতে থাকে।....

যাহা হউক, আমরা এই পুস্তকের অবতারণায় স্থির করিয়াছিলাম যে, কুমারীদের বিপথে যাওয়ার নিদানতত্ত্ব ও দৃষ্টান্তসমূহ পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়া, বিবাহিতা ও বিধবাদের কথা পরে আলোচনা করিব। এতদূর পর্যন্ত এই নিয়ম আমরা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন হইতে আমরা উহা আর রক্ষা করিব না। কারণ শেষ পর্যন্ত এই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে পুস্তকের কলেবর আশাতিরিক্ত বাড়িয়া যাইবে এবং গড়পড়তা পাঠক-পাঠিকার পক্ষে পুস্তক ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে; তদুপরি স্থানে স্থানে হয়তো তাঁহাদিগকে পুনরুক্তির ত্রুটিও লক্ষ্য করিতে হইবে।

বিশেষভাবে যে সকল ক্ষেত্রে উক্ত তিন জাতীয়া নারীদের বিপথ-গমনের কারণ এক হইতে দেখিব, সে সকল ক্ষেত্রে আমরা তিন জাতীয়া নারীকেই এক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিব।

প্ররোচনা কোন্‌দিক হইতে আসে

একটা কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কুমারীরা প্ররোচিত হয় পুরুষের দ্বারা এবং বহুক্ষেত্রে পুরুষগণ প্ররোচিত হয় বিবাহিতা নারী ও বিধবাদের দ্বারা। যেখানে একজন বিবাহিতা নারী বা বিধবা একজন ভৃত্য, পাচক, গোমস্তা, স্বামিবন্ধু বা প্রতিবেশী কোন যুবকের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সেখানে প্ররোচনা ও প্রশ্রয়-প্রদান নারীর তরফ হইতে আসা অধিকতর সম্ভব। অবশ্য যেক্ষেত্রে পুরুষটি উচ্চবংশের আশ্রয়-ও-অন্নদাতা অথবা ক্ষমতাশালী ও অবস্থাপন্ন, সেখানে অল্পবিস্তর প্ররোচনার ধারা তাঁহার নিকট হইতে উৎসারিত হইয়া আসে। প্ররোচনা না পাইয়াও—সম্পূর্ণ আপন অন্তরের তাগিদে অপ্রত্যাশিত-ভাবেও বহু নারী চরিত্র হারাইতে পারে। গৃহবাহিরের অপরিচিত দুর্বৃত্তের হস্তেও যেমন সে নিজের অনিচ্ছায় লাঞ্ছিত হইতে পারে, গৃহমধ্যে একান্ত ভক্তিভাজনের নিকটও সে উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের পবিত্রতাকে ডালি দিতে পারে। অতঃপর এই সকল ঘটনার দৃষ্টান্ত যথাস্থানে দিব এবং প্রতি দৃষ্টান্তের নিদানতত্ত্ব বাহির করিয়া তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশলাভের চেষ্টা করিব।....

শিক্ষিতের গৃহে শিক্ষকের অনিবার্যতা

এই অধ্যায়ে আমরা কুমারী কন্যা ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।....

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে অন্যান্য সভ্যদেশের দেখাদেখি ভারতেও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষায় সমগ্র ভারতের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকে আমি বিষদৃষ্টিতে দেখি না এবং উহার আগ্রহকে নিরুৎসাহ করার দলে আমি নই। কিন্তু পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা, শিক্ষালয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ের পার্থক্য বজায় রাখার এবং তাহাদের শিক্ষার কালকে সংক্ষিপ্ত করার পক্ষপাতী আমি। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায় ব্যতীত বিদ্যালয়ের অন্য স্তরে আমি সহশিক্ষার ঘোর বিরোধী। সর্বোপরি মেয়েদের বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক ও মেয়েদের জন্য পুরুষ গৃহশিক্ষক নিযুক্তির সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিকূলতাকামী আমি।

বিদ্যালয় অর্থে আমি নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্র ও অন্যান্য শিল্পশিক্ষালয়গুলিকেও বুঝাইতেছি এবং গৃহশিক্ষকের গণ্ডীতে আমি নৃত্য, গীত, বাদ্য শিক্ষাদানের মাহিনা-করা ওস্তাদদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিতেছি।

শুধু ধনী ও অভিজাত পরিবারে নহে, শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারেও ছেলেমেয়ের জন্য একজন গৃহশিক্ষক পোষা একটি ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে গৃহস্বামী তাঁহার পরিবারে সপ্তাহে একদিনের বেশী মৎস্য যোগাইতে পারেন না, কাহারো কঠিন অসুখ হইলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের খোঁজ করেন, বাড়িওয়ালা যাঁহার নিকট তিন মাসের ভাড়া না পাইয়া নালিশ করিবে বলিয়া বারবার শাসায়, তিনিও পুত্র বা কন্যাদের জন্য অন্ততপক্ষে একটি প্রাইভেট্ টিউটর না রাখিতে পারিলে শান্তি পান্ না; মূর্খা উচ্চাভিলাষিণী গৃহিণীও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দেন না।

বাংলার পল্লীগ্রামে এখনো স্ত্রীশিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে নাই। বিশেষত অনেক পল্লীতেই পৃথক প্রাথমিক অথবা মধ্যইংরাজী

বালিকা-বিদ্যালয় পর্যন্ত নাই। মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়ের উপযোগী অথবা ম্যাট্রিক পরীক্ষাদানোপযোগী শিক্ষাদানের উৎসাহ বা অর্থ-সামর্থ্য অতি অল্প পল্লীগৃহস্থের থাকে। ক্বচিৎ কোন স্ত্রীশিক্ষার অত্যুগ্র পক্ষপাতী উদারভাবাপন্ন শিক্ষিত সচ্ছল ব্যক্তি তাঁহার কন্যার বিদ্যালাভের ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া এবং কৈশোরে তাহার বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, হয়তো শহরে কোন আত্মীয়ের বাসায় তাহাকে বিদ্যালাভের জন্য পাঠাইয়া দেন্। শহরবাসী কোন ইচ্ছুক আত্মীয় না থাকিলে, কন্যাকে অগত্যা বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট হোস্টেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হোস্টেলে থাকিয়া তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে পারিবারিক জীবনে নিজেদেরকে সানন্দে মানাইয়া চলিতে প্রস্তুত হইতে পারে না; সেখানে সুশিক্ষা যতখানি পায় কুশিক্ষা তদপেক্ষা অনেক বেশী পায়; বিবিয়ানা, বাচালতা ও আত্মম্ভরিতায় রীতিমত দক্ষতা লাভ করে। মেয়েদের হোস্টেল-জীবনের কথা অতঃপর একটু ভালো করিয়া আলোচনা করিব; এখন আমরা বিদ্যালয়-শিক্ষক ও গৃহ-শিক্ষকদের কথায় ফিরিয়া আসি।

শিক্ষকের অধিকার

শহরে ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে ছেলেমেয়ের জন্য একটি মাস্টার মশাই না থাকা এবং পল্লীর অবস্থাপন্ন গৃহস্থঘরে একটি গাভী না পোষা সমানই লজ্জা ও শোচনীয় ত্রুটির কথা। ছাত্রদের কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। তথাপি এইটুকু বলিয়া যাওয়া প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষকের হস্তে অল্পবয়স্ক ছাত্র তথ্যগত ও কার্যগত কামজ্ঞানে হাতেখড়ি লাভ করে; পাণিমেহনে দীক্ষিত হয় নতুবা তাঁহার কুরুচিজাত সমরতির উত্তরসাধকরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র

পড়াইতে আসিয়া যুবক-শিক্ষক বাড়ির মহিলাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং কেহ কেহ অন্দরমহলে গতায়াতের অবাধ অধিকার পায়। এইভাবে পরিচয় ঘনিষ্ট হইতে হইতে বাড়ির কোন মহিলা হয় শিক্ষককে প্রলুব্ধ করেন, নতুবা শিক্ষকের দ্বারা প্রলুব্ধ হন্। কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশ হইয়া পড়া শিক্ষক মানে মানে অথবা মান হারাইয়া চাকরি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান্; কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে লইয়া গোপনে সরিয়া পড়েন। কোথাও পাড়ার ছেলেরা একদিন মাস্টারকে উত্তম-মধ্যম দিয়া বাড়িছাড়া করে। কোথাও কেলেঙ্কারি অনেক দূর গড়ায়—এমন কি আদালত পর্যন্ত।

অনেক বাড়িতেই মেয়ে-বউরা নিজেরা আসিয়া শিক্ষককে চা-জলখাবার পরিবেশন করেন, নতুবা তাহাদিগকে দিয়া ফাই-ফরমাসটা খাটাইয়া লন্। ছোটখাটো বিনীত কথা ও ছোটখাটো উপকারের ভিতর দিয়া দুইটি তরুণ হৃদয় ক্রমশ নিকটবর্তী হয়; শেষে সুযোগে ও দুর্যোগে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বৈধতার সীমা লঙ্ঘন করে। এমন দুই-চারিটি কেস জানি যেখানে গৃহশিক্ষককে লইয়া বাটীর একাধিক স্ত্রীলোকের মধ্যে লোফালুফি ও অর্ধপ্রকাশ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। শিক্ষক বেচারা প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অথবা কাহকেও তুষ্ট করিতে না পারিয়া শেষটা কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কোথাও মাস্টার তাঁহার এক বা একাধিক ছাত্রীকে সিনেমা, থিএটার, খেলার মাঠ, মার্কেট বা চিড়িয়াখানায় লইয়া যান্। ঘরের মোটর থাকে তো ভালই, নতুবা যাওয়ার সময় ট্রাম বা বাস, ফেরার সময় রিক্স বা ভাড়াটে ফীটন্। নিসংশয়ে বলিতে পারি, বিনা-বর্ষায় রাত্রি সাড়ে-আটটা বা সাড়ে-এগারোটার সময় যে সকল রিক্স ঘেরাটোপ হইয়া সওয়ারী লইয়া যায়, তাহাদের অনেকগুলির

পর্দা উদ্ঘাটন করিলে বিশ্রম্ভমগ্ন তরুণ গুরুশিষ্যাকে দেখা যাইবে। ইহা রূঢ় নির্লজ্জ সত্য।

শিক্ষক যদি যুবক ও অবিবাহিত হয় এবং ছাত্রীদের গৃহে আহার্য ও বাসস্থান পায়, তাহা হইলে শুধু ছাত্রীর সহিত নহে, ছাত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অথবা অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের সহিত প্রণয়-সংঘটনের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা তাহার নিকট আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। শিক্ষক যদি একটু বর্ষীয়ান্ ও বিবাহিত হন, বিনয়পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বাড়ীর কর্তাগিন্নির মনোহরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি ও দুশ্চরিত্রতার স্বরূপ নিঃসন্দিগ্ধতার আবরণে অতি সুন্দরভাবে ও বহুকাল পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিতে পারেন। মাস্টার মশাই বলিতে বাড়ীর সকলে যেন অজ্ঞান! ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভালোভাবে কৃতকার্য না হইলেও তাঁহার আসন বড়-একটা টলে না। সকল শিক্ষকই শুকদেব গোস্বামী নন্—এ সত্য নানাদিক হইতে উপলব্ধি করিয়াও গড়্পড়্তা শিক্ষক-বৎসল গৃহস্থ নিজ গৃহের শিক্ষক ও কন্যা সম্বন্ধে অতি উচ্চ অভিমত পোষণ করেন। মাস্টার যাইহোক্, মেয়ে আমাদের তেমন নয়—এ আত্মপ্রবঞ্চনামূলক ধারণা কত কর্তাগৃহিণী যে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই!

বিবাহিত হোক্ বা অবিবাহিত হোক্, কুরূপ হোক্ বা সুরূপ হোক্, যুবক হোক্ বা বৃদ্ধ হোক্, তাহাতে কিছু আসে যায় না, শিক্ষকের সহিত ছাত্রীদের প্রেমে পড়ার প্রবণতা কেমন করিয়া বিধাতা একের বা উভয়ের মনে উপ্ত করিয়া দেন—তাহা তিনিই জানেন। এমনো দেখিয়াছি যে, কুমারী, বিবাহিতা বা বিধবা ছাত্রী শিক্ষকের সহিত পবিত্র সম্পর্ক পাতাইয়া ও প্রথম-প্রথম তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিয়া, শেষে মনে মনে তাঁহাকে অনিবার্য প্রণয়ীর আসনে বসাইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ইহা উপন্যাসের কথা নয়, নিছক সত্য।

কখনও কখনও এই ভালবাসাটা একতরফা, আধ্যাত্মিক ও সংগোপন থাকিয়া যায়। কখনো কখনো দুইতরফা ও নিতান্ত কায়িক ব্যাপারে পরিণত হয়।

নিজের স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া ছাত্রীকে লইয়া প্রৌঢ় শিক্ষক দেশান্তরিত হইয়াছেন অথবা তাহাকে বিবাহ করিয়া আপন কুটিরের অধীশ্বরী করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি ঘটিয়াছে। অবিবাহিত বা মৃতদার শিক্ষক ও অধ্যাপক নিজের ছাত্রীকে তাহার অভিভাবকদের সম্মতি লইয়া বা না লইয়া বিবাহ করিয়াছেন অথবা কুলের বাহির করিয়া কিছুদিন পরে তাহাকে গুণ্ডা ও লম্পটদের হাতে সঁপিয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—এরূপ উদাহরণ খুঁজিলে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। শিক্ষকদের মধ্যেও ছদ্মবেশী শয়তান হাজার হাজার আছে—সর্বদেশে ও সর্বকালে। কিন্তু একথা বাঙালী গৃহস্থ যেমন করিয়া ভোলে, এমন করিয়া আর কোন জাতি ভোলে না।

উল্টাডিঙ্গি স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের কুকীর্তি

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে বোধ হয় কাহারো কাহারো স্মরণ থাকিতে পারে—কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা উল্টাডিঙ্গির একটি মেয়ে-স্কুলের এক তথাকথিত হেড্‌মাস্টারের কুকীর্তির কথা। যাঁহারা ঘটনাটার কথা জানেন না, তাঁহাদিগকে একটু সংক্ষেপে বলি। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটার ইতিহাস আমার মনে নাই। তথ্যগত খুঁটিনাটিগুলি সম্বন্ধে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। মোটামুটি ঘটনাটা বলিতে গিয়া কোথাও কোন প্রয়োজনীয় পয়েন্ট বাদ পড়িতে—কোথাও সামান্য কিছু সংশ্লেষঘটিত ভুলচুক্ হইতে পারে।...এই একটিমাত্র ঘটনা বাংলার লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়গামিনী কন্যার পিতার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করিতে পারিত, এখনো পারে।...

উল্টাডাঙ্গার এক নবপ্রতিষ্ঠিত মেয়েস্কুলের যুবা-বয়স্ক হেড্‌মাস্টার উচ্চশ্রেণীর একটি ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি চারিটার পর পড়াশুনায় পশ্চাৎপদ তিন-চারিটি মেয়েকে লইয়া কোচিং ক্লাস করেন। শেষে মাঝে মাঝে ঐ একটি মেয়েকে লইয়া কোচিং-ক্লাস করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়-গৃহে তখন জনপ্রাণী থাকে না, স্কুলের দরোয়ান্ দরজার কাছে বসিয়া পাহারা দেয়—বেলা চারিটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে কাহারো প্রবেশাধিকার নাই। এই মেয়েটিকে তিনি ক্রমশ প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার দেহ লইয়া প্রায় সর্ববিধ বিলসন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং ম্যাট্রিক পাস করিলে পর শেষে তাহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

মেয়েটির একটি ছোট বোনও ঐ স্কুলে পড়িত। বড়টির বয়স বৎসর ষোলো, ছোটটির বয়স চৌদ্দ সাড়ে-চৌদ্দ হইবে। সেটির প্রতিও হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের কুদৃষ্টি পড়ে। তাহাকেও মাঝে মাঝে তিনি ছুটির পর নিজের কামরায় ডাকিয়া পড়া বলিয়া দিতেন; শেষে তাহার সহিত একটু আধ্‌টু হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে তাহাকে অঙ্কে বসাইয়া চুম্বন করিতেও লাগিলেন। এইভাবে উভয় ভগ্নীকে সুচতুর শিক্ষকপ্রবর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ও আসক্ত করিয়া তুলিলেন।

শেষে ভদ্রলোকটি একদিন বড় ভগ্নীটিকে বলিলেন যে, শীঘ্রই বোধহয় তাঁহাকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হইতেছে, কারণ মেসে থাকা ও সেখানকার জঘন্য খাদ্য খাওয়া তাঁহার পোষাইতেছে না, শরীর ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রীর বাড়িতে শিক্ষকতা-কার্যের বিনিময়ে তিনি থাকিতে ও খাইতে পান্, তাহা হইলে তাঁহার ঐ স্কুলে থাকা পোষায়। মেয়েটি তাহার পিতার হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের অসুবিধার কথা বলিয়া তাঁহাকে

তাহাদের নিজেদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিবার অনুরোধ জানাইল। স্নেহান্ধ পিতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। দিন কয়েকের মধ্যে হেড্-মাস্টারটি ছাত্রীদ্বয়ের বাড়িতে বিছানা-বাক্স লইয়া হাজির হইলেন। তেতলার একটি ক্ষুদ্র চিলে-কোঠার মধ্যে তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করা হইল। বাড়ির সকলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

ছুটির পর কোচিং-ক্লাস আর বসে না। বসাইবার প্রয়োজনই বা কি? জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি দোতলা হইতে প্রায়-নিত্য গভীর নিশীথে তেতলায় হেড্মাস্টার মহাশয়ের ক্ষুদ্র অন্ধকার কামরাটিতে প্রবেশ করে এবং কিছুক্ষণ পরে সন্তর্পণে নীচে নামিয়া যায়। তখনো পর্যন্ত ছোট ভগ্নীটির কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এতকাল তাহাকে চুম্বন-নিপীড়নাদি করিয়াই তিনি তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু একদিন তাহার পবিত্রতাটুকু সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

সেদিন জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি মাস্টার মশাইকে পূর্ব হইতেই জানাইয়া গিয়াছিল যে, ঐ রাত্রিতে সে গোপন অভিসারে আসিতে পারিবে না। ত্রিতলে আর একখানি ছোট ঘর ছিল। সেইখানিতে কনিষ্ঠা ভগিনীটি ও তাহার ঠাকুরমা থাকিতেন। ঐদিন গভীর রাত্রিতে সেই ঘরের দরজার গায়ে মাস্টারের ঘন ঘন করাঘাত পড়িতে থাকিল। 'কে' বলিয়া বৃদ্ধা পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মাস্টার কাৎরাইতে কাৎরাইতে উত্তর করিল, 'আমি ঠাকুমা। পেটের যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মতো ছট্‌ফট্ কচ্ছি। যদি সোডা কিংবা জোয়ানের আরক আপনাদের ঘরে থাকে তো ছোট খুকিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন্। শুনেছি নারকেল তেল আর জল পেটে মালিশ কর্লে বেদনা কমে। খুকি কি মিনিট দুচ্চার একটু মালিশ কোরে দিতে পারবে আমায়? উঃ, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না ঠাকুমা, আমি শুতে গেলুম।'

ঠাকুরমা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ছোট খুকিকে জাগাইয়া (সম্ভবত সে পূর্বেই

জাগিয়া উঠিয়াছিল) হজমের ঔষধ ও নারিকেল তৈল লইয়া তাহাকে মাষ্টারের কক্ষে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ছোট খুকি কিছুক্ষণ বেজায় ঘুম ও অনিচ্ছার ভাণ করিয়া শেষটা ঠাকুরমা ও শিক্ষককে মৃদু গালি পাড়িতে পাড়িতে উঠিয়া আসিল।...অর্ধঘণ্টা পরে মেয়েটি যখন তাহার সর্বাপেক্ষা শ্লাঘার বস্তুকে বিসর্জন দিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল, তখন ঠাকুর মা অঘোরে নিদ্রামগ্ন।...

এইভাবে দুইভগ্নী পালা করিয়া একদিন অন্তর শিক্ষকের কামরায় আসিয়া লুকাইয়া শয়তানের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিল। মা-বাপ-ঠাকুরমা-খুড়ি-জ্যেঠিরা এই বিনা-মাহিনার বর্ণচোরা মাস্টারটার দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে কোন আভাসই পাইলেন না; তাঁহারা একটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবার হস্তে প্রস্ফুটযৌবনা দুইটি মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন! আশ্চর্য উদারতা!

এদিকে স্কুলে শিক্ষকমহলে প্রধান শিক্ষকের চরিত্র ও বিদ্যাবত্তা লইয়া তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল এবং তাঁহার দুর্ব্যবহার পরিচালক-সমিতির দুই-একজন সদস্যের কানে উঠিয়াছিল। এমন সময় একদিন একখানি পোস্টকার্ড স্কুলের কেরানির হাতে আসিয়া পৌঁছিল। পোস্টকার্ডখানি আসিয়াছে কোন মুসলমানের নামে, তাহাতে ঠিকানা দেওয়া আছে স্কুলের। কেরানিটির সন্দেহ হইল—এ ঠিকানায় পোস্টকার্ডখানি আসিল কেন, স্কুলে কোন মুসলমান কর্মচারিই নাই। তারপর ভদ্রলোক পোস্টকার্ডখানি পড়িয়া দেখিলেন, সুদূর কোন পল্লীগ্রাম হইতে কোন মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখিতেছেন যে, তিনি বহুদিন যাবৎ তাহার কোন সংবাদ পান্ না। কলিকাতার স্কুলে সে শিক্ষকের পদ লাভ করিয়াছে, ইহা তাঁহাদের পরিবারের পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু সে চিঠি লেখে না কেন? তাহার মেসে তিনি কয়েকখানা পত্র দিয়াছিলেন,

কোন উত্তর পান্ নাই। পুজার ছুটিতে অবশ্যই সে যেন দেশে আসে, তাঁহারা সকলে তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক....ইত্যাদি।

কেরানি-বাবুটির মনে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রখানি পরদিন স্কুলের দুই-চারিজন শিক্ষককে দেখাইলেন। তাঁহারাও এই প্রহেলিকাপূর্ণ পত্রের অন্তরালে ক্ষীণালোক দেখিতে পাইয়া যেমন খুশী তেমনি বিস্মিত হইলেন। পোস্টকার্ডখানি জনৈক শিক্ষক হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের কক্ষে গিয়া তাঁহার টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "দেখুন তো সার, এক মুসলমানের নামে এই চিঠি এসেছে স্কুলের ঠিকানায়। এরকম নামের কোন লোক তো এখানে নেই।" চিঠিখানি অনিচ্ছার সহিত হাতে তুলিয়া লইয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় ক্ষণেকের জন্য চমকিয়া উঠিয়া বেশ একটু বিবর্ণ হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাইতো, আশ্চর্য ব্যাপার বটে! নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করেছে। Wrong address লাল কালি দিয়ে লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিন্; নইলে ছিঁড়ে ফেলে দিন না।"

কিন্তু ইহার কোনটাই করা হইল না। শিক্ষক মহাশয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রধান শিক্ষকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করে নাই। তিনি চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া আসিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে চিঠি ও তাহার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ লইয়া কিছুক্ষণ গোপনে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলিল; পরিশেষে স্থির হইল উহা স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয়কে পৌছাইয়া দিয়া তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করা হইবে।

রীতিমত মনমরা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া প্রধান শিক্ষকমহাশয় তাঁহার ছাত্রীদের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।....পরদিন সকালে সেই বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহার

ছাত্রীদ্বয় সহ উধাও হইয়াছেন। সেইসঙ্গে মেয়েদের গহনাপত্র ও বেশ-কিছু নগদ টাকাও অন্তর্হিত। পুলিশে খবর দেওয়া হইল, ডায়েরি করানো হইল। সেই পোস্টকার্ডখানির সূত্র ধরিয়া পুলিস অনুসন্ধান করিতে করিতে বাহির করিয়া ফেলিল যে, পোস্টকার্ডখানি ঠিক ঠিকানায়ই আসিয়া পৌছিয়াছিল। হেড্‌মাস্টারটি মুসলমান, নাম ভাঁড়াইয়া হিন্দুর নামগ্রহণ করিয়া স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ অধিকার করিয়াছিল। যে হিন্দুটির নাম সে গ্রহণ করিয়াছে, সে তাহার গ্রামবাসী এক সহপাঠী বন্ধু; তখন বাংলার বাহিরে চাকরি করে সে। তাহারই এম্-এ পাশের সার্টিফিকেটখানি কয়েক দিনের জন্য চাহিয়া লইয়া সে চাকরির সন্ধানে কলিকাতায় আসে এবং উল্টাডিঙ্গির নবপ্রতিষ্ঠিত মেয়ে-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের নিমিত্ত দরখাস্ত করে। তাহার দরখাস্তখানিই স্কুল-কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়; তখন সে সেকেণ্ড ক্লাসে এম-এ পাশের সার্টিফিকেটখানি সভ্যদিগকে প্রদর্শন করে। আসলে সে ইণ্টারমিডিয়েট্ পর্যন্ত পড়িয়াছিল এবং সম্ভবত ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছিল। পুলিশ এই কেসের কিনারা করিতে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার ও মেয়ে দুইটির সন্ধান পাওয়া গেল না।

হাওড়া জেলার কোন গ্রামে ঐ মুসলমান যুবকটি মেয়ে দুইটিকে আনিয়া রাখিয়াছিল। জনবিরল স্থানে এক পোড়ো বাড়ী, সেইখানে মেয়ে দুইটি প্রায় নজরবন্দী হইয়া থাকে। তাহাদের গহনাপত্র এক এক করিয়া টাকায় পরিবর্তিত হইয়া এই জোড়া-তাড়া দেওয়া ব্যভিচারদুষ্ট সংসারের কল্যাণে ব্যয়িত হইতে থাকে। যুবকটি মেয়ে দুইটিকে দিনরাত চোখে চোখে রাখে; কেবল একবার হাটে-বাজারে যখন যায়, তখন সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যায়। মেয়ে দুইটি একটু ফাঁক পাইলেই কাঁদে এবং বাপমাকে সংবাদ দিবার

জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। একদিন জানালায় দাঁড়াইয়া তাহারা একটি রাখাল বালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাকে ডাকিয়া তাহারা চুপি-চুপি একখানা পোস্টকার্ড আনাইয়া লয় এবং তাড়াতাড়ি পেন্সিলে দুইছত্র পিতার নিকট লিখিয়া ঐ ছেলেটির হাতে দিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেওয়ায়। ঐ সঙ্গে এক টুক্‌রা কাগজে নিকটস্থ থানার দারোগাকে নিজেদের দুরবস্থার কথা সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠায়।

ইহার পর ব্যাপারটা খুব সংক্ষিপ্ত। মুসলমান যুবকটি গ্রেপ্তার হয়, বালিকা দুইটিকে উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার চলে। বিচারে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস হয়।....

এই কাহিনীটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা নৈতিক আইনের চক্ষে অপরাধী আরো গুটিকয়েক প্রাণীকে দেখিতে পাইব। তাহারা কে কে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন? দোষী প্রথমত স্কুলের কর্তৃপক্ষ। মেয়ে-স্কুলে পুরুষ শিক্ষক রাখা অমার্জনীয় অপরাধ। স্কুলপরিচালক কমিটির সদস্যগণ বৎসরে দুইটি তিনটি মিটিং করিয়া ও চা-জলখাবার খাইয়া তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিতেন। তাঁহারা খোঁজ রাখিতেন না প্রতিদিন স্কুল কিভাবে চলে, মেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাঁহারা নিয়মিতভাবে স্কুল পরিদর্শনও করিতেন না। হেড্‌মাস্টার নিয়োগের সময় তাহারা অবশ্যই তাঁহার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে ভালো করিয়া খোঁজখবর করেন নাই। হেড্‌মাস্টারের পদে একজন যুবক না লইয়া একজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকে—একজন মফস্বলের লোক না লইয়া একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা উচিত ছিল। তদুপরি, একজন ইণ্টারমিডিয়েট্ ফেল-করা ব্যক্তির সহিত একজন এম-এ পাস-করা ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধির পার্থক্য ধরিবার ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্যের নিশ্চয়ই কমিটীতে অভাব ছিল না। এক বা একাধিক কিশোরী ও সুরূপা ছাত্রী লইয়া ওই হেড্‌মাস্টার কোচিং ক্লাস করেন

—এই সংবাদ স্কুল-কমিটির রাখা ও তাহাতে ঘোর আপত্তি করা উচিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, অপরাধী—মেয়েদের পিতা, মাতা, ঠাকুরমা প্রভৃতি। 'অজ্ঞাত-কুলশীলস্য বাসো দেয়ং ন কস্যচিৎ' এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহারা এই শঠ লম্পট যুবককে একেবারে অন্দরমহলে ত্রিতলে স্থান দিয়াছিলেন—ভক্তিমান গৃহস্থগণ বৃদ্ধ কুলগুরুকে যেখানে অস্থায়িভাবে বাস করিতে দেয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণ পরিবার, হিন্দুধর্মের সর্বপ্রকার কৃষ্টি, সংস্কার ও পবিত্রতার প্রতীক বলিয়া নিশ্চয়ই মনে মনে গর্ব পোষণ করিতেন। অথচ যাহাকে গৃহে স্থান দিলেন, তাহার বংশপরিচয় জাতির পরিচয় স্বভাবের পরিচয় একবারও লইলেন না—আশ্চর্য নয় কি? সে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের রান্নাঘরে আর পাঁচজন গৃহবাসীর সহিত একত্র বসিয়া দিনের পর দিন ভোজন করিয়াছে; অবশ্যই তাহার উচ্ছিষ্ট আহার্য-পানীয় বাড়ির ছেলেমেয়েদিগকে খাইতে দিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সমর্থা কন্যা দুইটি দিনেরাতে মাস্টারের বিজন কক্ষে আসিয়া শুধু লেখাপড়া করে নাই, আড্ডা দিয়াছে, তাহার সহিত হাসিঠাট্টা করিয়াছে, বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছে, তাহাকে গান গাহিয়া শুনাইয়াছে,—ইহা বাড়ির কাহারো চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে নাই! তারপর মেয়ে দুইটি মাঠাকুরমার পার্শ্ব হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সন্তর্পণে উঠিয়া মাস্টারের কক্ষে আসিয়া তাহার শয্যাসঙ্গিনী হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে—শুধু এক-দুইদিন নহে, মাসের পর মাস, প্রায় প্রতিদিন,—তবু কাহারো ঘুম ভাঙে নাই। সর্বোপরি আরো তাজ্জব এই যে, ঠাকুরমা নিশুতি রাতে নাতিনীটিকে মাস্টারের পেটে তেল মালিস করিবার জন্য বিনা দ্বিধায় ছাড়িয়া দিলেন এবং পরমুহূর্তে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িলেন।...

ভৃত্য, পাচক, ড্রাইভার ও মাস্টার সম্বন্ধে বহু বাঙালী ভদ্রলোকের অনেকটা এই ধরণের নির্লজ্জ অমার্জনীয় সর্ববিস্মারক মোহ আছে। মোহভঙ্গ যখন হয়, তখন দেখা যায় তাহার পূর্বেই চূড়ান্ত অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে; সারা জীবনের খেদ ও অনুশোচনা সে অনিষ্ট পূরণ করিতে পারে না।

দুর্ভাগ্য শিক্ষাসভ্যতাভিমানী বাঙালী জাতির, দুর্ভাগা বাঙ্‌লা দেশের!

দ্বিতীয় আলোচনা

ওস্তাদের মার্

এক বিগতপ্রায়যৌবন ভদ্রলোক হঠাৎ পূর্ববঙ্গের কোন মফস্বল শহরে আসিয়া তাঁহার গানবাজনার কলানৈপুণ্যে সমস্ত শিক্ষিত সমাজকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়া দিলেন। বয়স তাঁহার পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইবে। তিনি খদ্দরের কাপড়-পাঞ্জাবী গেরুয়া রঙে ছোপাইয়া পরিধান করেন। মাথায় গৈরিক বর্ণের গান্ধী টুপী, পায়ে কটা রঙের স্যাণ্ডাল। যাত্রাদল-সুলভ দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঈষৎ কুঞ্চিত মিশ্‌মিশে কালো বাব্‌রি চুল, বড় বড় চোখের কোণে মিহি করিয়া সুর্মা টানা। গোঁফদাড়ি কামানো। গায়ের রঙ্ উজ্জ্বল শ্যাম, দেহ নাতিবলিষ্ঠ ও নধর। কানের ভাঁজে হেনার আতর ভেজানো তুলা গোঁজা, কপালে একটি শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কাটা থাকে। দাঁতগুলি দুধের মতো ধব্‌ধবে। পান খান না—জয়িত্রী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও বড় এলাচের দানা ছোট ছোট তালমিশ্রির টুকরার সহিত মিশাইয়া একটি ছোট্ট রূপার ডিবার মধ্যে রাখেন, তাহারই এক চিমটি মাঝে মাঝে তুলিয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া চিবান্।

যুগ্ম ঠোঁটের দুই কোণ নীচের দিকে ঈষৎ বক্র; দেখিলে মনে হয় মুখের মধ্যে বহু রহস্য চাপিতে গিয়া ঠোঁট দুটি দুইদিকে বেঁকিয়া গিয়াছে। কথা অল্প বলেন এবং রবিবারে নিরামিষ খান্। নাম তাঁহার নিরঞ্জন গোস্বামী (তাঁহার পদবিটি ঠিক রাখিয়া নামটি একেবারে বদলাইয়া দিলাম)। বলেন, দেশ তাঁহার শান্তিপুরের কাছাকাছি কোন এক গ্রামে।

নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে একটি শাক্‌রেদ ছিল; এই ২৭।২৮ বৎসরের ট্যারা-চক্ষুবিশিষ্ট কুশ্রী যুবকটি একাধারে তাঁহার তবল্‌চি ও তল্লিদার। সত্যই সে ভালো তবলা ও পাখোয়াজ বাজায়, গানও মোটামুটি মন্দ জানে না। সে-ও নাকি ব্রাহ্মণসন্তান প্রয়োজনমতো রান্নাবান্না করিতে পারে। স্টীমারে আসিবার সময় এক অবস্থাপন্ন সহযাত্রীর সহিত নিরঞ্জনের আলাপ-পরিচয় ঘনীভূত হয়; ভদ্রলোকটি সঙ্গীতরসজ্ঞ ছিলেন। নিরঞ্জনের সঙ্গে সেতার দেখিয়া ও মুখে সঙ্গীতবাদ্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া ভদ্রলোকটি মুগ্ধ হইলেন এবং শহরে তাঁহার গৃহে নিরঞ্জন ও তাহার শিষ্যটিকে দিন কয়েক বাস করিবার অনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।

নিরঞ্জনবাবু সশিষ্য তাঁহার আশ্রয়দাতার গৃহের একতলার একটি কক্ষে আসিয়া ডেরাডাণ্ডা বিছাইলেন। পরদিনই সন্ধ্যাকালে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় একটি ছোটখাটো গানের আসর বসিল; উহাতে শহরের কয়েকজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইলেন। নিরঞ্জন গোস্বামীর ঠুংরি, গজল, খেয়াল, ভজন, দরবারী কানাড়া ও নটনারায়ণ শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার সেতার ও আড়বাঁশির আলাপ শুনিয়াও লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহার কয়েকদিন পরে সরকারী প্রেক্ষাগারে টিকিট বিক্রয় করিয়া নিরু গোঁসাইয়ের গানের জলসা বসে। বিক্রয়লব্ধ অর্থের অধিকাংশ গায়ককে দেওয়া হয়। তদুপরি তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া শহরের দুইজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে দুইখানি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন।

ইহার পর শহরের ভিতর ও উপকণ্ঠের নানা স্থান হইতে নিরঞ্জনের সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। শহরের নানা বাড়ীতে রাত্রিতে তাহারা দুইজন গাহিয়া বাজাইয়া, চব্যচোষ্য রকমের আহার

করিয়া ও স্ত্রীপুরুষের মুগ্ধ স্তুতি আহরণ করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শহরের এক জমিদারের ম্যানেজার ও মোটর আসিয়া তাহাদের উভয়কে সম্বর্ধনা করিয়া জমিদার-ভবনে লইয়া গেল। জমিদারের বহির্বাটীর একখানি সুসজ্জিত কক্ষে ইহাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইল। জমিদার নিজেও কিছু গানবাজনা জানিতেন। প্রত্যহ বেলা নয়টার সময় তিনি তাঁহার গৃহান্নপুষ্ট এক বৃদ্ধ ওস্তাদের নিকট বহুকাল ধরিয়া গান শিখিয়া আসিতেছেন। প্রাণে তাঁহার সুর বসিয়াছিল অনেকখানি, কিন্তু দীর্ঘ অধ্যবসায়ও গলায় তেমন বসিতে চাহে নাই। প্রায় কুড়ি বৎসরের চেষ্টার ফলে সেতারে তাঁহার হাত পাকিয়াছিল খানিকটা।

গোস্বামী আসিবার পর হইতে পুরাতন ওস্তাদের কদর অনেকখানি কমিয়া গেল। জমিদার তেজেন বাবু (নামটা অবশ্য প্রতীয়মান কারণে পরিবর্তিত) প্রত্যহ নিরঞ্জনবাবুর নিকট গানের ও বাজনার তালিম লইতে লাগিলেন। নিরঞ্জনবাবু নাকি কোচিন রাজ-দরবারে দুই বৎসর কাল থাকিয়া আসল দরবারী কানাড়া শিখিয়াছিলেন, সেই সুরের কসরৎ তিনি মন দিয়া আয়ত্ত করিতে সুরু করিলেন।

গোস্বামীর ইচ্ছা ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, বম্বাই, গুজ্‌রাট ও রাজপুতানার প্রধান প্রধান শহরে হিন্দুসঙ্গীতের মহিমা ও বাংলার উচ্চ কীর্তনাঙ্গ প্রচার করিয়া বেড়াইবেন; সঙ্গে আরো জনকয়েক এদেশীয় ও ভিন্নপ্রদেশীয় শিষ্যশিষ্যা সঙ্গে লইবেন। আবাল্য ব্রহ্মচারী তিনি, সঙ্গীত শাস্ত্র তাঁহার আজন্মের তপস্যা—তাহার পঙ্কোদ্ধার ও গৌরব বর্ধনের জন্য তিনি জীবন-মন সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি —পুরে মাত্র তিন দিনের জন্য যাইতেছিলেন, তথা হইতে শ্রীহট্ট, শিলং, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, পাবনা প্রভৃতি কয়েকটি শহর ভ্রমণ করিয়া, কলিকাতায় ফিরিবেন; তথা হইতে

জন কয়েক শিষ্যশিষ্যা লইয়া হয় গোয়ালিয়র নয় পণ্ডিচেরি যাইবেন—এইরূপ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে এক ভদ্রলোকের অনুরোধে এই শহরটীতে একদিনের জন্য আতিথ্য স্বীকার করিতে গিয়া নিরঞ্জন ওস্তাদ মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত প্রোগ্রাম্ বানচাল হইয়া গেল। তিনি জমিদারের আতিথ্যের বন্ধন কাটিয়া চলিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন।

জমিদারের দুইটি ছেলে, একটি মেয়ে। বড় ছেলেটি পশ্চিমের কোন স্থানের সরকারী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। মেয়েটি মেজো, স্থানীয় মেয়ে-স্কুল হইতে ম্যাট্রিক দিয়াছে—পরীক্ষার ফল বাহির হইতে তখনো কিছু বিলম্ব আছে। ছোট ছেলেটির ৮।৯ বৎসর বয়স। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়ে সে। গৃহপালিত বৃদ্ধ ওস্তাদের নিকট মেয়েটি কিছুকাল হইতে গান ও এস্রাজ বাজানো শিখিতেছে।

তেজেনবাবু একদিন সবিনয়ে গোস্বামীকে বলিলেন, "ওস্তাদজী, আপনাকে বল্‌তে তো সাহস পাই না। আপনি যদি দয়া কোরে আরো মাসখানেক এখানে থাকেন—থেকে আমাকে আর রণুকে (রণিতা—কন্যার ছদ্মনাম) যদি একটু তালিম দিয়ে যান, তাহলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আপনার মতো ধ্যানী জ্ঞানী বিশারদের কাছে যে ক'টা দিন শিখতে পাই, সেই ক'টা দিনই লাভ। অবশ্য আপনি যে পারিশ্রমিক চাইবেন তাই দেব। জানি আপনি টাকার কাঙাল নন্। বেশী কিছু নয়, ওকে অন্তত একখানা দরবারী কানাড়া, খান দুয়েক রামপুরী গজল্ আর খান দুয়েক মধুকানের ঢপ্ যদি রপ্ত করিয়ে দিয়ে যান্, ব্যস্ তাহলেই আমি খুশী।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর গোস্বামিজী পনেরো দিন থাকিতে রাজি হইলেন। তেজেন বাবু সকালে এক ঘণ্টা ও রণিতা

সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করিয়া ওস্তাদজীর নিকট তালিম লইবেন—এইরূপ কথা থাকিল। তেজেন বাবুর গলা সাধা ও গান শেখার উৎসাহ অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কমিয়া গেল, কিন্তু রণিতার উৎসাহ রীতিমত বাড়িয়া গেল। নিরু গোঁসাই এই বাড়িতে আসার পর হইতেই সে বৃদ্ধ ওস্তাদজীকে প্রায় প্রকাশ্যভাবেই অশ্রদ্ধা করিতে এবং মা বাবা ও ওস্তাদজীর নিকট গোঁসাইয়ের গুণের শতমুখে ব্যাখ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

গোস্বামীর সঙ্গে একটি শ্বেত পাথরের অতিক্ষুদ্র নারায়ণ বিগ্রহ ছিল। তাঁহার শয়ন কক্ষের এক কোণে একটি পিতলের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়া তিনি নিত্য প্রভাতে উহার পূজা করিতেন। রণু নিত্য প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া নিজেদের অন্দরের বাগান হইতে পূজার ফুল তুলিয়া সাজি ভরিয়া গোঁসাইকে আনিয়া দিত। তেজেনবাবু বেলা তিনটার আগে কোনদিনই মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেন না, কাজেই তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করা কোন অতিথি-কুটুম্বের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। আগে পাচক তাঁহাদের দুইজনের জলখাবার ও প্রধান আহার্য বহির্বাটীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পৌছাইয়া দিয়া যাইত। দিন কয়েক পরে রণিতা তাহার পিতামাতা ও পিসিমাকে বলিয়া গোস্বামী ও তাহার চেলা গোকুলের খাওয়ার ব্যবস্থা অন্দরমহলে রান্নাবাড়িতে করিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় তাহাদের গৃহসংলগ্ন লক্ষ্মীনারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দিরে আরতির সময় রণু গত দুই বৎসরের মধ্যে বার কয়েক মাত্র গিয়াছিল; কিন্তু বিজন কক্ষকোণে একান্তে গুরুজী নিরঞ্জন প্রাণ ঢালিয়া নিতান্ত সাদাসিধা রকমের যে পূজারতি করেন, তাহাতে সে নিত্য উপস্থিত হয় এবং শ্রদ্ধাপ্রেমপুলকোচ্ছ্বাসে গদগদ হইয়া পূজকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। পূজা সমাপ্ত হইলে প্রসাদ পাইয়া সে

গীতবাদ্যের পাঠ গ্রহণ করিতে বসে। গুরুজী সেতার ধরেন, শিষ্য গোকুল বাঁয়া-তবলায় সঙ্গৎ করে। এক ঘণ্টা ক্রমশ দেড় ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ক্রমশ দুই ঘণ্টায় গড়ায়। শেষে বাড়ির ভিতর হইতে পিসিমা খাওয়ার জন্য ডাকিয়া পাঠান। তখন যেন রণুর ধ্যান ভাঙে।

দিন দশেক পরে কলিকাতা হইতে তেজেন বাবুর নিকট একখানি জরুরি টেলিগ্রাম আসিল। পাঁচ আনি হিস্যার কর্তা তাঁহার খুড়তুতো ভাই জানাইতেছেন যে, রণিতা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে যে, রণিতা ম্যাট্রিক পাস করিতে পারিলে, কলিকাতায় গিয়া হয় লরেটোয় নতুবা বেথুনে ভর্তি হইবে। তাহার কাকার প্রকাণ্ড বাড়ি আছে সার্কুলার রোডের কাছে। কাকিমার একটি মাত্র ভগ্নস্বাস্থ্য ছেলে মুসৌরির কোন ইউরোপীয়ান্ বোর্ডিং স্কুলে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পড়ে, একটি মেয়ে হইল না বলিয়া তাঁহার মহা আফ্‌শোষ। রণুকে তিনি নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন। তাঁহাদেরই বাড়িতে থাকিয়া সে কলেজে পড়িবে স্থির হইয়া ছিল।

মেয়ে পাস করিয়াছে বলিয়া পাড়ায় পাড়ায় একদিন দধিমিষ্টান্ন বিতরিত হইল। গৃহে একদিন যাত্রাগানও হইল। কয়েকদিন ধরিয়া বাড়িতে গানবাজনা-জলসা-খাওয়া-দাওয়া মহা হৈচৈ লাগিয়া রহিল। দিন পাঁচ ছয় পরে রণিতা কলিকাতা যাওয়ার জন্য বাক্স-বিছানা গুছাইতে লাগিল। এদিকে নিরঞ্জন গোস্বামীও সশিষ্য কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তেজেন বাবু গোস্বামীকে বলিলেন, "আপনি যখন কলকাতায় যাচ্ছেন, তখন রণিতাকে সঙ্গে নিয়ে যান্। শিয়ালদা স্টেসনে ওর কাকিমা মোটর নিয়ে উপস্থিত থাকবেন, আমি টেলিগ্রাম কোরে দিচ্ছি। আপনার একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ও গোকুলের একখানা ইণ্টার ক্লাসের টিকিট্ আমি

কিনে আন্‌তে বলেছি। রণুর আর আপনার বার্থ রিজার্ভ করা থাক্‌বে। আপনি যখনি কিছুদিনের জন্যে কল্‌কাতায় থাক্‌বেন, তখনি সপ্তাহে দু'দিন বা তিন দিন আমাদের কল্‌কাতার বাসায় গিয়ে রণুকে একটু গান শিখিয়ে আসবেন। আপনার কি পারিশ্রমিক দিতে হবে, আমায় এখানে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবেন, আমি পাঠিয়ে দেব।"

পরদিন যথাসময়ে তেজেন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের কন্যাকে লইয়া নিজেদের বাড়ির মোটরে চড়িয়া স্টেসনে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দিল; তেজেন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী সজলনয়নে প্লাট্‌ফর্মের উপরে খানিকক্ষণ চলমান ট্রেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শুধু কন্যার বিচ্ছেদ ভাবিয়া নহে, এই সঙ্গীতজ্ঞ ঈশ্বরভক্ত স্বল্পভাষী ব্যক্তিটির জন্যও তাঁহাদের মনের অনেকখানি স্থান যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইল।....

পরদিন সন্ধ্যার সময় তেজেন বাবুর নিকট আর একখানি টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত। প্রকাণ্ড টেলিগ্রাম। কলিকাতা হইতে তাঁহার ভাই জানাইতেছেন যে, শিয়ালদহ স্টেসনে তাঁহারা স্বামিস্ত্রী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন প্রায় ঘণ্টা খানেক বিলম্বে পৌঁছে। কিন্তু রণু বা গুরুজী কেহই সে ট্রেনে পৌঁছে নাই। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গায়ে দুইজনের নামে রিজার্ভেশন টিকেট লাগানো ছিল। গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহারা দুইজনেই গোয়ালন্দ স্টেসন হইতে ট্রেনে চড়িয়াছিল; কিন্তু মনে হয় রাণাঘাটের পর আর তাহাদিগকে দেখা যায় নাই।

টেলিগ্রাম পাইয়া তেজেন বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা বড় বোনের চক্ষুস্থির। কথাটা বাড়ির অন্য সকলের নিকট অপ্রকাশিত রহিল।

টেলিগ্রামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সেই রাত্রিতেই স্বামিস্ত্রী দুইজনেই পরদিন কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা ও সলজ্জ অনুশোচনায় সে রাত্রিতে তিনটি প্রাণীর কাহারো চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

তেজেনবাবু যাওয়ার পথে রানাঘাটে নামিয়া ঘণ্টা কয়েক অবস্থান করিলেন। স্টেসনের সমস্ত কর্মচারীকে ও কুলিদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। একজন রেলওয়ে-পাহারওয়ালা বলিল, দুইদিন পূর্বে ঢাকা মেল ভোরবেলা রানাঘাটে আসিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক বিলম্ব করে। ঐ দিন সেকেণ্ড ক্লাস হইতে একটি ফর্সা মেয়েকে লইয়া একজন সন্ন্যাসী গোছের ভদ্রলোক অবতরণ করেন। অন্য কামরা হইতে আর একজন রোগা মতো কালো ভদ্রলোক একটি বড় সেতার ও অন্যান্য মালপত্র লইয়া, নামিয়া ঐ দুইজনের সহিত মিলিত হয়।

একজন কুলি বলে, সে ও আর একটি কুলি উহাদের বাক্স-বিছানা ও অন্যান্য মালপত্র কৃষ্ণনগর লোক্যালে তুলিয়া দেয়। সেদিন যে কর্মচারীটি গেটের নিকট টিকিট সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও বলিলেন যে, ঐরূপ তিন ব্যক্তিকে তিনিও দেখিয়াছেন। তাঁহার ব্যাপারটা আরো মনে থাকিবার কারণ হইল এই যে, সাধু-বেশধারী ব্যক্তিটি যখন কৃষ্ণনগর লোক্যালের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট টিকিট চাহেন। ভদ্রলোকটি তাঁহাকে কলিকাতা পর্যন্ত গন্তব্যস্থল-লেখা দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাসের ও একখানি ইণ্টার ক্লাসের টিকিট দিয়া বলেন যে, তাঁহারা এইখানেই যাত্রা শেষ করিলেন, কারণ কৃষ্ণনগরে তাঁহাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন। তারপর গৈরিক খদ্দরধারী ভদ্রলোকটি তিনখানি কৃষ্ণনগরের সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কাটেন।...

রেলওয়ে পুলিসের নিকট একটা ডায়েরি লিখাইয়া, পরবর্তী একখানি ট্রেনে তেজেনবাবু সস্ত্রীক কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণনগরে পৌছিয়া তাঁহারা স্টেসনে খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐদিন বাব্‌রি চুলওয়ালা একটি ভদ্রলোক, একটি কালো ট্যারা চোখ্‌ওয়ালা লোক ও একটি সুন্দরী তরুণী নামিয়াছিল এবং তাহাদের মালপত্রের সহিত একটি হস্তিদন্তখচিত সুদৃশ্য সেতারও ছিল। বাব্‌রি চুলওয়ালা ভদ্রলোকটির গায়ে গিলে-করা আদ্ধির পাঞ্জাবী ছিল, চোখে সোনার চশমা ছিল এবং মাথায় খদ্দরের টুপি আদৌ ছিল না। তাহারা স্টেসনের ওয়েটিং রুমে ঘণ্টা দু'-আড়াই ছিল। মালপত্র স্টেসন-মাস্টারের জিম্মায় রাখিয়া তাহারা একখানা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া শহর ভ্রমণে গিয়াছিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া স্বরূপগঞ্জের টিকিট কাটিয়া ছোট রেলগাড়িতে চড়িয়া যাত্রা করে।

স্বরূপগঞ্জে আসিয়া জানা গেল যে, তাহারা স্টেসনে নামিয়া গঙ্গাপার হইয়া নবদ্বীপে গিয়াছে। নবদ্বীপে খোঁজ করিয়া বহুকষ্টে এইটুকু জানা গেল যে, তাহারা একরাত্রি স্থানীয় কোন ধর্মশালায় ছিল। রেলওয়ে স্টেসনে খোঁজ করিয়া তাহাদের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। নবদ্বীপে কোতোয়ালী থানায় আর একটা ডায়েরি করাইয়া, তেজেনবাবু স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি হাওড়া রেলপুলিসে ও কলিকাতা ডিটেক্‌টিভ্‌ ডিপার্টমেণ্টে নিরঞ্জনের নামে কন্যাহরণের এজাহার লিখাইয়া দিলেন এবং পুলিসের কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যে কর্মচারী তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তিনি পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবেন! কন্যা-উদ্ধারের আসায় তাঁহারা স্বামিস্ত্রীতে তিন মাস কাল কলিকাতায় বসিয়া থাকিয়া, হতাশ হইয়া বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দেশে ফিরিয়া গেলেন।...

এই ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তেজেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজেন্দ্র রুড়কি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সবে অন্তিম পরীক্ষা দিয়াছিল। এক বৎসর সে দেশে আসে নাই। পরীক্ষা দিয়া তাহারা চারিবন্ধু মিলিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। তারপর তাহারা যে যাহার গৃহে ফিরিবে। ব্রজেনের সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিল পাঞ্জাবী শিখ, একজন বাঙালী, আর একজন যুক্তপ্রদেশবাসী। দেরাদুন, মুসৌরী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমন্‌ঝোলা বেড়াইয়া, তাহারা বিজনৌরে দোলপূর্ণিমার বিরাট মেলা দেখিবার জন্য রওনা হইল। শিখ যুবকটি লস্কর স্টেসনে আসিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া পশ্চিমগামী পাঞ্জাব মেলে চড়িয়া দেশে চলিয়া গেল।

বিজনৌরের মেলা দেখিয়া তাহারা তিন বন্ধুতে সন্ধ্যার পর এক ধর্মশালায় আসিয়া আশ্রয় লইল। রক্ষকের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বহু কষ্টে দোতলায় ছাতের একধারে একখানি অতিক্ষুদ্র কামরায় তাহারা স্থান লাভ করিল। হাতমুখ ধুইয়া ধর্মশালার সম্মুখস্থ এক ময়রার দোকানে পেট ভরিয়া পুরি-কচুড়ি-জিলাপি-মালাই খাইয়া তাহারা ঘরে আসিয়া যে-যাহার বিছানা পাতিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ধর্মশালার দরোয়ান্ খড়ম পায়ে দিয়া খটাখট্ শব্দ করিতে করিতে ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিল, "আজকের রাত্রিতে রোগী যে, সে-ও ঘুমোয় না। আজ ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে সারারাত্রব্যাপী উৎসব। অন্যান্য নানা দফার আমোদপ্রমোদের মধ্যে এক কল্‌কত্তাওয়ালী বাইজীর নাচগান আর দু'জন পুরুষ ওস্তাদের গান আর পাখোয়াজী সঙ্গৎ আছে। তারা একশো টাকা বায়না নিয়েছে।" কলিকাতার নাচিয়ে-গাইয়ের নাম শুনিয়া তাদের মধ্যে অন্তত দুইজনের শ্রান্ত চক্ষুর প্রান্ত হইতে নিদ্রার পদচিহ্ন যেন নিমেষে মুছিয়া গেল। তাহারা

তখনি সাজিয়া-গুজিয়া, কামরায় তালা বন্ধ করিয়া ঠাকুরবাড়ির দিকে যাত্রা করিল।

ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দির ও চতুষ্পার্শ্বের প্রশস্ত চত্বর লোকে-লোকারণ্য। যুক্তপ্রদেশবাসী সহপাঠীটির পরামর্শে উহারা তিনজনেই খালিপায়ে গিয়াছিল। চত্বরের এক কোণে শ্রীকৃষ্ণলীলা বা ঐ গোছের একটা হিন্দী যাত্রাগান—আর এক কোণে কথকতা হইতেছে। নাট-মন্দিরের উপরে একটু বিশিষ্ট রকমের ভদ্রলোকদের ভিড়। প্রশস্ত শ্বেতপাথরের মেঝের উপর আগাগোড়া শতরঞ্চি পাতা; শতরঞ্চির মাঝখানে একটা অংশে বড় একখানা গালিচা পাতা। উচ্চাঙ্গের নৃত্য-গীতবাদ্য হইতেছে এইখানটায়। দেবমন্দিরের সেবাইৎ, 'ঠাকুর-সাহেব' পদবিধারী স্থানীয় জমিদার ফর্সি মুখে দিয়া গালিচার একদিকে সপার্ষদ উপবিষ্ট; অন্যদিকে ৮।৯ জন গাইয়ে-বাজিয়ে ও ৩।৪ জন বাইজী বা নাচওয়ালী। জমিদারের আশেপাশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট; উচ্চ নাটমন্দিরের চতুর্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বহুলোক জলসা উপভোগ করিতেছে।

ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া তিন বন্ধুতে নাটমন্দিরের কোল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া একেবারে সিঁড়ির ধারে গিয়া দাঁড়াইল; বসিবার জায়গা এক তিলও কোথাও ছিল না। তখন একজন হিন্দুস্থানী বাইজী নৃত্যগীত করিতেছিল, একজন সারেঙ্গী সারেঙ্ বাজাইতেছিল ও তবলচি তবলা বাজাইতেছিল। গাইয়ে-বাজিয়েদের প্রায় সকলেরই মাথায় গান্ধীটুপি, কে বাঙালী ও কে অবাঙালী—তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। বাইজীর নৃত্যগীতের পর একজন নধরকান্তি সৌম্যদর্শন শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত ধোঁয়াটে চশমাধারী মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক সেতার লইয়া ভজন গাহিতে সুরু করিলেন। এই ভদ্রলোকটি বাঙালী হইলেও হইতে পারেন। ইঁহার ভজনের পর একখানি খেয়াল সুরু

হইল। খেয়াল শেষ হইতে না হইতে ব্রজেনের বাঙালী বন্ধুটির ঠ্যালাঠেলি চেঁচামেচির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গান শুনিবার উৎসাহ একেবারে স্তিমিত হইয়া গেল; সে ধর্মশালায় ফিরিয়া যাইবার জন্য জিদ্ ধরিল। ব্রজেন বলিল, "আর পাঁচ-সাত মিনিট দাঁড়ানো যাক্ ভাই। একখানা নাচ দেখে তবে যাব। ওদের মধ্যে কে বাঙালী তা তো বুঝতে পাচ্ছি না; আসর শেষ না হ'লে আলাপ করাও যাবে না। যাক্‌গে, এই next itemটা দেখে তবে যাচ্ছি।"

খেয়াল শেষ হইলে, শল্লাচুম্‌কি-খচিত ব্রোকেডের পেশোয়াজ-পরা, মাথায় ফুলের মুকুট ও ওড়্‌না-আঁটা, এক লাবণ্যময়ী তরুণী বাইজী উঠিয়া, নূপুরনিক্কনোচ্ছ্বসিত চলচঞ্চল পদবিভঙ্গে গাহিতে লাগিল—

"ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।"

ব্রজেনের সমস্ত শিরাধমনীর মধ্যে যেন তপ্ততরল সিসা ঢালিয়া দিল; তাহার সর্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিল। বাইজীটি তাহার আদরের বোন রণিতা। তাহার বাঙালী বন্ধুটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নটীর পূজার সুপরিচিত গানখানি তন্ময় হইয়া শুনিল। তারপর ঘুমবিজড়িত চক্ষে হাই তুলিতে তুলিতে ব্রজেনের হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিল। ব্রজেন অস্পষ্ট কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি আর একটু পরে যাচ্ছি ভাই, তোমরা ফিরে যাও। দরজা বন্ধ করে শুয়ো।"

নাটমন্দিরের নাচগানের আসর ভাঙিল রাত্রি একটার পর। ব্রজেন বুঝিতে পারিল ঐ ভজন-খেয়ালগায়ক সৌম্যদর্শন ব্যক্তিটিই

তাহার ভগ্নীর অপহরণকর্তা। ভগ্নীকে ওই পাষণ্ডের কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে এবং উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। আসর ভাঙার কিছুক্ষণ পরে ভিড় কমিয়া গেলে পর নিরু গোস্বামী, তাহার চেলা ও রণু বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া মন্দিরের অনতিদূর ঠাকুর সাহেবের অতিথশালার দিকে যাইতে লাগিল। একদল লোক ওস্তাদ-জীকে বাহবা দিতে দিতে তাহার পিছন পিছন অতিথশালার দরজা পর্যন্ত গিয়া, একে একে বাড়ি চলিয়া গেল। ব্রজেন এই দলের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের বাসস্থান চুপে চুপে দেখিয়া লইয়া, তখনই থানা খুঁজিতে লাগিয়া গেল। সেখানে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া, তাঁহার সাহায্য-ভিক্ষা করিল। সেই রাত্রিতেই হাওড়া রেলওয়ে পুলিসকে কেসের পূর্ণ বিবরণ ও রণিতার একখানা ফটো চাহিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইল। স্টেসনে গিয়া ব্রজেন তাহার পিতাকে অগৌণে আসিবার জন্য তার করিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে আসামী দুইজনকে ও রণিতাকে পুলিস থানায় লইয়া আসিল। রণিতার নূতন নামকরণ হইয়াছিল বিজুরিবাই। থানায় আসিয়া ব্রজেনকে দেখিবামাত্র একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া রণু তাহার পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা ভাঙিবার কিছুক্ষণ পরে সে থানার সমস্ত কর্মচারী, স্থানীয় একজন উকিল, ঠাকুর সাহেবের ম্যানেজার ও ব্রজেনের সম্মুখে যে এজাহার দিল, তাহা যেমন অভাবনীয় তেমনি মর্মন্তুদ। বিবরণটা সংক্ষেপে এই।....

দুই বৎসর পূর্বে পিত্রালয় হইতে কলিকাতায় স্টীমারে আসিবার সময় আহার্য বা পানীয়ে সম্ভবত কিছু ঘুমের ঔষধ মিশাইয়া দেওয়ার ফলে রণিতা ক্যাবিনের মধ্যে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। বোধ হয় গোয়ালন্দে স্টীমার আসিয়া লাগিবার কিছু পূর্বে তাহার নিদ্রার গভীরতা খানিকটা কমিয়া গেলে সে আপন গোপনাংশে রীতিমত যন্ত্রণা

অনুভব করে এবং কাহাকেও আল্‌গাভাবে তাহার দেহোপরি প্রলম্বিত বলিয়া বোধ করে। নিদ্রা ভাঙিয়া গেলেও সে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারে নাই, বাধা দিবার জন্য অঙ্গাদি-বিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াও কৃতকার্য হয় নাই, দুই-চারিবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে মাত্র। তারপর সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

—ঘাটে তাহাকে জাগাইয়া তোলা হয়। তাহার সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হইয়া ছিল, চোখের কোল হইতে ঘুমের আমেজ সে কিছুতেই তাড়াইতে পারে নাই। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় কোন-মতে সে ঘাটে নামিয়া ট্রেনের কামরায় আসিয়া উঠে। কামরায় গোঁসাই ছাড়া আর কোন সহযাত্রী ছিল না। খানিকক্ষণের জন্য একখানা বেঞ্চির উপর এলাইয়া পড়িয়া রণিতা পূর্বাপর ভাবিবার চেষ্টা করিল; ভাবিতে গিয়া সব কিছুই যেন মনের কুয়াসায় তালগোল পাকাইয়া গেল। শুধু এইটুকু ধারণা তাহার মনে বিঁধিয়া বিঁধিয়া বসিয়া গেল যে, ওই সাধুবেশী গোঁসাই শয়তান তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। তাহাদের পরম বিশ্বাস ও চরম শ্রদ্ধার সুন্দর পুরস্কার দিয়াছে সে। তাহার গোপনাঙ্গ তখন যন্ত্রণায় ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, রক্তে তাহার কাপড় ও সায়ার একাংশ জব্‌জবে হইয়া গিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে, গোস্বামী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় বলাৎকার করে। তারপর তাহাকে শৌচাগারে গিয়া নিজের কাপড় ও সায়া কাচিতে সে বাধ্য করে। ঐ দুইখানা কাচিয়া কামরার মধ্যেই মেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার সমস্ত দেহমনের ভিতরটা যেন একেবারে ভাঙচুর হইয়া গিয়াছিল; গোঁসাইকে প্রাণ ভরিয়া গালাগালি দিবার অথবা বুক ফাটাইয়া কাঁদিবারও যেন তাহার শক্তি ছিল না। অস্পষ্ট মনে পড়ে—গোঁসাই তাহাকে নানারূপ সোহাগ-বাণী শুনাইতে শুনাইতে ও ভবিষ্যতের নানা উজ্জ্বল ছবি দেখাইতে দেখাইতে তাহার

গাত্রে হাত বুলাইতে থাকে। তারপর সে পাশ ফিরিয়া পুনরায় অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে।

ইহার পর সকাল বেলা তাহাকে জাগাইয়া তোলা হয় এবং তাড়াতাড়ি ট্রেন হইতে নামিতে বলা হয়। রাণাঘাট স্টেসনে নামিয়া তাহারা অন্য একটি লাইনের ট্রেনে চড়ে। ট্রেন বদল করা হইল কেন একবার ক্ষীণভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে, তাহাতে গোঁসাই উত্তর দিয়াছিল যে, এ ট্রেন রাণাঘাটে দুই ঘণ্টা আটক থাকিবে; সেইজন্য তাহারা অন্য লাইন দিয়া কলিকাতায় যাইতেছে। কলিকাতায় তাহারা যায় নাই। কৃষ্ণনগর হইতে স্বরূপগঞ্জের ঘাট পার হইয়া তাহারা নবদ্বীপে আসে ও একরাত্রি কোন ধর্মশালায় কাটাইয়া নৌকাযোগে কাটোয়ায় আসে। সেখান হইতে তাহাকে গোকুলের জিম্মায় রাখিয়া গোঁসাই তাহার সেতার ও অন্যান্য জিনিস-পত্র লইয়া অদৃশ্য হয়।

গোকুল তাহাকে গ্রামের বাহিরে একটি বৃদ্ধার কুটিরে আনিয়া তুলে। বৃদ্ধাকে সে পিসিমা বলিয়া সম্বোধন করিত। পিসিটি তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল এবং নিরু গোঁসাই যে কিরূপ ঐশ্বরিক (আসুরিক?) শক্তিসম্পন্ন ও ধনবান, তাহার নানারূপ কাহিনী শুনাইতে লাগিল। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে তাহার প্রকাণ্ড জমিদারি আছে; এ অঞ্চলের সমস্ত পুলিস সাহেব, ইন্সপেক্টর, জজ্, ম্যাজিস্ট্রেট্ সমস্ত তাহার হাতের মুটোর মধ্যে; নেপালের কাছে তাহার প্রকাণ্ড শাল ও শিশুর জঙ্গল আছে—একমাত্র তাহা হইতে বৎসরে তাহার লাখখানেক টাকা আয় হয়…ইত্যাদি। গোকুলের পিসির বাড়ি ৪।৫ দিন থাকিয়া, তাহারা আজিমগঞ্জ যাত্রা করে। আজিমগঞ্জে সেকেণ্ড ক্লাস ওএটিং রুমে রাত্রিতে শুইয়া থাকিবার সময় গোকুল পানোন্মত্ত অবস্থায় জোর করিয়া রণিতার দেহোপভোগ করে।

তথা হইতে তাহাকে নানা স্থান ঘুরাইয়া মধুবাণীর উত্তরে জয়নগর নামক স্থানের নিকট এক জনবিরল পল্লীতে আনিয়া উপস্থিত করা হয়। ইহার উত্তরে কিছুদূরে নেপালের সীমানা ও গভীর জঙ্গল। এই স্থানে এক বাঙালী ভদ্রলোকের কাঠের কারবার আছে। ভদ্রলোকটির নাম নবকুমার বাবু (অবশ্য ছদ্মনাম)। তিনি সস্ত্রীক এখানে বাস করেন। ইনি নিরঞ্জনের বাল্যবন্ধু। নিরু পূর্বেই এখানে আসিয়া গোকুল ও রণিতার প্রতীক্ষা করিতেছিল। বন্যজন্তু-অধ্যুষিত এক নির্জন জঙ্গলের ধারে একখানি ছোট বাংলোর মধ্যে একপ্রকার নির্বাসিত অবস্থায় রণিতা বৎসরাধিক কাল যাপন করে। এইস্থান হইতে তাহার পলাইবার কোন উপায় ছিল না। গলা ফাটাইয়া কাঁদিলেও বনের পাখী ছাড়া আর কেহ শুনিতে পাইত না।

মাস দুয়েকের মধ্যে সে ইহাদের পোষ মানিতে বাধ্য হয়। তাহাকে পোষ মানাইবার জন্য শুধু অশ্রাব্য গালিগালাজ নহে, অকথ্য অত্যাচারও তাহার উপর করা হইত। একাদিক্রমে দুইতিন দিন ধরিয়া তাহাকে অনাহারে রাখা হইয়াছে। গোকুল ও গোঁসাই বহুবার তাহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে।

এই বাংলোটি নবকুমার বাবুর নির্মিত। এইখানে তিনি জয়নগর হইতে মাঝে মাঝে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। স্থানীয় পাহাড়ী বালিকা ও বধূরা প্রায়ই গোপনে আসিয়া তাঁহার ব্যভিচারস্পৃহায় রশদ যোগাইয়া যাইত। তাহা ছাড়া অন্যান্য স্থান হইতে গণিকারাও মাঝে মাঝে আসিয়া এখানে নৃত্যগীত ও রূপ বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া যাইত। গোকুল ও গোঁসাই ব্যতীত নবকুমারবাবুর নিকটও রণিতাকে নিয়মিত আত্মদান করিতে হইত। শুধু তাই নয়, তাহাকে অল্পে অল্পে মদ্যপানেও অভ্যস্ত করা হইয়াছিল।

এক বৎসর পরে নবকুমার বাবুর গলায় ক্যান্সার হওয়ায় তিনি

দীর্ঘকালের জন্য রাঁচি চলিয়া যান্। পরে সেখানেই নাকি তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতোমধ্যে লাহোর হইতে তাঁহার ছোট ভাই আসিয়া কারবারের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন ও গোঁসাইকে দলবল সহ অবিলম্বে বাংলো ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলেন। এক বৎসর ধরিয়া গোঁসাই গোঁফ্ দাড়ি রাখিতে সুরু করিয়াছিল। ঐ সময় সে তাহাকে নানা জাতীয় গীতবাদ্যে পারদর্শী করিয়া তুলে। গোকুল নাকি কলিকাতার কোন প্রাইভেট থিএটার সম্প্রদায়ের নৃত্যশিক্ষক ছিল। সে তাহাকে নৃত্যকলায় খানিকটা তালিম দেয়; বাকিটা সে নিজের চেষ্টায় ও তথায় অস্থায়িভাবে আতিথ্যভোগিনী নানা শ্রেণীর বাইজীদের নিকট হইতে শিখিয়া লয়। হিন্দী ভাষায়ও সে মোটামুটি নির্ভুলভাবে কথাবার্তা কহিতে অভ্যস্ত হয়।

তারপর তাহারা জয়নগর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরভারতের নানা-স্থানে বড় বড় জমিদার ও তালুকদারদের বাড়িতে মুজ্‌রো করিয়া বেড়াইতে থাকে। ইহাতে তাহাদের বেশ উপার্জন হইতেছিল; কিন্তু জুয়া, গাঁজা ও মদে গোঁসাই ও গোকুল সর্বস্ব অপব্যয় করিত। বার কয়েক তাহারা প্রভূত উৎকোচ পাইয়া জন কয়েক হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতের নিকট রণিতার দেহকে ভাড়া খাটিতে দিয়াছিল। রতিজ ব্যাধি তাহার দেহে দুইবার প্রকাশ পায়; ডাক্তারী ঔষধের ইঞ্জেকশন লইয়া সে রোগমুক্ত হয়।...

ইহার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করিলে চলিবে। তেজেনবাবু ও ব্রজেনবাবুর হেফাজতে রণিতাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কলিকাতা হইতে পুলিস আসিয়া গোঁসাই ও গোকুলের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। প্রকাশ পাইল, গোঁসাইয়ের দেশ মুর্শিদাবাদের কোন পল্লীতে। কোর্টে মাম্‌লা উঠিলে সেখান হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা, ততোধিক

বৃদ্ধা অন্ধ ঠাকুরমা ও তাহার স্ত্রী একটি শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র পুরোহিত পরিবার। তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলে মায়া হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তেজেনবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও রণিতার পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন।

সর্বপ্রথমে নরম হইল রণিতা। সে পিতাকে বলিল মাম্‌লা উঠাইয়া লইতে। বলিল, "আমার সর্বনাশ তো হয়েছেই, আর একটা গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারের—একজন সতীলক্ষ্মীর সর্বনাশ করি কেন! আপনারা যদি পুলিসকে বলে' মাম্‌লা মিটিয়ে না নেন, তাহলে আমি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নেব আর বিজনৌরের পুলিসের কাছে যে এজাহার দিয়েছি তা প্রত্যাহার করব।" মেয়ের এই আবদারের কাছে তেজেনবাবুর সমস্ত তেজ স্তিমিত হইয়া গেল। তাঁহার ছোট ভাই ও স্ত্রীও এই সকল কেলেঙ্কারি আদালতে ও সংবাদপত্রে তোলার বিপক্ষে রায় দিলেন। অগত্যা তেজেনবাবু পুলিসের কর্তাদের বলিয়া-কহিয়া মাম্‌লা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।...

কিন্তু রণিতা আর দেশে ফিরিল না, কাকার বাসায়ও আর থাকিতে চাহিল না। সে সিনিয়র টীচার্স ট্রেণিং কোর্স পড়িবার জন্য কোন হোস্টেলে গিয়া উঠিল।....

টীচার্স ট্রেণিং কোর্স শেষ করিয়া সে এই শহরের কোন অবৈতনিক প্রাথমিক কন্যাবিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর সে ইচ্ছা করিয়াই পিতৃপরিবারের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া পড়ে। বহুকাল সে বিবাহ করে নাই বলিয়া জানি। কেই বা তাহাকে বিবাহ করিত?....

কলিকাতার কোন বিখ্যাত ধনী ঠিকাদার রণিতার অতীত জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞানের সুযোগ লইয়া তাহার বাসস্থলে দিন কয়েক

হানা দিয়াছিলেন এবং তাহার পদে নানা মূল্যবান উপঢৌকন ঢালিয়া দিয়া তাহাকে আপন রক্ষণাধীনে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, পৃষ্ঠদেশে কয়েক ঘা স্যাণ্ডাল খাইয়া এই প্রৌঢ় দেশভক্ত ব্যক্তিটি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসেন।....

কলাশিক্ষা—এদেশে ও এদেশে

এই ঘটনাটি কুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহার অতি সামান্য অংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক এইরূপ জঘন্য দুর্ঘটনা হয়তো বাংলাদেশে এতাবৎ অধিক সংখ্যক ঘটে নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প বিয়োগবিধুর এই জাতীয় ঘটনা বাঙালী নাগরিক পরিবারে আজিও প্রচুর ঘটিতেছে। এরূপ ঘটনার কথা আমরা সংবাদপত্রে 'আইন-আদালত' শীর্ষক স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাই, পাড়ায় বা বাড়ির পাশে হয়তো ঘটিতে দেখি, অফিসের বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে মাঝে মাঝে বোধ হয় দুই একটি সংবাদ শুনি। তথাপি আমরা আমাদের বাড়ির মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনাকে মনে স্থান দিতে একেবারে নারাজ।

ভারতের কোন প্রদেশে তো নয়ই, পৃথিবীর মধ্যে কোন সভ্য ও সভ্যতাভিমানী দেশেই ভদ্র পরিবারে ছেলেমেয়েদের নিমিত্ত এত প্রাইভেট টিউটর ও গানবাজনার ওস্তাদ নিযুক্ত করার রেওয়াজ নাই। এই অভ্যাস শুধু ফ্যাশন নয়—দুস্ত্যাজ্য বাতিকে পরিণত হইয়াছে। এই বাতিক যে কত দুর্নীতির বীজ ছড়াইতোছ, কত অনটনের সংসারে যে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন জ্বালাইতেছে, তাহার হিসাব করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি আমাদের চেতনা হয় না।

পাশ্চাত্ত্যের প্রায় সকল সভ্য দেশেই মেয়েদের নৃত্য-গীত-বাদ্য

শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্কুলকলেজের সহিত সংযুক্ত থাকে ; ইহার জন্য সামান্য কিছু অতিরিক্ত ফী দিলেই চলে। কোথাও কোথাও এই জাতীয় কলা-বিদ্যাশিক্ষা ঐচ্ছিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অতিরিক্ত ফী লাগে না। সঙ্গীতকলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিক মেয়েদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে। নৃত-গীত-বাদ্যের শিক্ষয়িত্রীরা ওদেশে প্রায় সকলেই সু-শিক্ষিতা ভদ্রঘরের হয়। মেয়েদের বিদ্যালয়ে শ্মশ্রুগুম্ফ-যুক্ত-বা-মুক্ত পুরুষ ওস্তাদের প্রবেশ নিষেধ। ক্বচিৎ কোন বড়লোকের বাড়িতে একজন পিয়ানো-শিক্ষক রাখা হয়। সেখানে কথায় কথায় নাচের মাস্টার গানের মাস্টার কোন গৃহস্থবাড়িতে নিযুক্ত করা হয় না। নগর-বাসিনী মেয়েদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষার আগ্রহ ও অন্তঃপুরের সর্ব-রহস্যভেদী বৃহন্নলা-রক্ষার কুগ্রহ—বাংলাদেশে নানা নূতন দুর্ভাগ্যের সহিত ভয়াবহরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে।

গৃহস্থালয়ে গানের মাষ্টার

শহরে একখানি বা দুইখানি ঘর ভাড়া করিয়া এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ থাকেন। বারান্দার এক কোণে হয়তো রান্নাঘর, অন্য কোণে বাথ্‌রুম। এখানে সদর অন্দর বহিঃপুর অন্তঃপুর বলিয়া কোন বালাই নাই। সব ঘরই শোওয়ার ঘর, বসার ঘর, রোগীর ঘর, ভোগীর ঘর, পড়ার ঘর, ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থরক্ষিত সেই একখানা ঘরে বা দুইখানা ঘরের একখানায় ছেলেমেয়েদের পড়ানোর মাস্টার গান শেখানোর মাস্টার আসিতেছে এবং নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

মনে করুন…এক কোণে একটি ছেলে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ইংরাজী গদ্য পড়িতেছে, আর একটি ছেলে পড়িতেছে বাংলা পদ্য, অন্যজন অঙ্ক কষিতেছে ; একদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি রোগী শুইয়া

রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। এমন সময় কর্তার অফিসের কোন বন্ধু আসিয়া কোনমতে সেই ঘরের মধ্যে উপবেশন করিয়া কর্তার সহিত শেয়ার মার্কেটের কথা অথবা হায়দরাবাদের যুদ্ধের কথা কহিতে লাগিলেন ; তাহা লইয়া রীতিমত তর্ক ও কথা কাটাকাটিও চলিল। সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়ার মাস্টারের আবির্ভাব। তিনি উঠিতে না উঠিতে গানের মাস্টারের প্রবেশ। ততক্ষণে হয়তো পিতা ও পিতৃবন্ধু সে ঘর হইতে বাধ্য হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। নতুবা সেতার, হার্মোনিয়ম্ বা এস্রাজ, ওস্তাদজী ও এক বা একাধিক ছাত্রীর তথায় স্থানসংকুলান হয় না।…কোন বাড়িতে ঘরে স্থান সংকুলান না হইলে ভিতরদিকের ঢাকা বারান্দায় অথবা ছাতে সতরঞ্চি বা মাদুর পাতিয়া ওস্তাদকে বসানো হয় ; সেইখানে তিনি পূরবী-ভৈরবী-ভূপালী-ইমনে ছাত্রীদিগকে তালিম দিয়া ইমান্ রক্ষা করেন।

একজন ছাত্রী বিদ্যাশিক্ষকের সহিত যেটুকু ব্যবধান রক্ষা করিয়া পাঠগ্রহণ ও দান করিতে পারে, ততটুকু ব্যবধান একজন সঙ্গীতবাদ্য বা নৃত্যশিক্ষকের সহিত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। অনেক সময় শিক্ষককে তাঁহার ছাত্রীর গাত্রস্পর্শ করিতে হয়, ছাত্রীকে শিক্ষকের সুরে সুর মিলাইতে হয়, ভাবে ভাব মিলাইতে হয়। ওস্তাদের সহিত তাহার হৃদয়ের যোগাযোগ—একান্ততা ও একাত্মতা ঘটে প্রচুর। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়িতে লোকের ভিড়ে অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অতিনৈকট্যের অববোধে ওস্তাদ-ছাত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণটা দৈহিক পরিপূর্তির পথে সচরাচর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

ধনিগৃহে ওস্তাদের সুযোগ-সুবিধা

কিন্তু ধনীর গৃহে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কারণ সেখানে উপযুক্ত মেয়ের শয়ন ও পঠন-কক্ষ অথবা গানবাজনার

কক্ষ পৃথক থাকে। অভিভাবকদের উপস্থিতি থাকে দূরে ও দৃষ্টি থাকে অন্যত্র। ছেলেমেয়েরা কি শিখিতেছে, কি খাইতেছে এবং কোথায় যাইতেছে না যাইতেছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর তাঁহারা বড়-একটা রাখেন না। সুতরাং ওস্তাদ ও শিক্ষক ছাত্রীদের সহিত নিরিবিলিতে সুরালাপের ফাঁকে ফাঁকে প্রেমালাপ করিবার অবসর পান প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে না হোক্, কোন কোন ক্ষেত্রে এই আলাপ নানাবিধ আপত্তিকর ক্রিয়া-কলাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় নিঃসন্দেহ।

আশ্চর্য, মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার প্রাইভেট্ টিউটর সর্বক্ষেত্রেই যেরূপ পুরুষমানুষ ও প্রায় ক্ষেত্রেই যেমন যুবাবয়স্ক বা অবিবাহিত ব্যক্তি হয়, গীতবাদ্যের গুরুরাও ঠিক সেইরূপ পুরুষমানুষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণবয়স্ক, ফিটফাট বাবু ও প্রিয়দর্শন হয়। শুধু তাহাই নহে, ওস্তাদদের মধ্যে কেহ কেহ হন্ পশ্চিমা হিন্দু অথবা মুসলমান। আমাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা—আমিষ-রন্ধন, পোষাক-কর্তন, শকট-চালন, বিড়ি-প্রস্তুতি ও সঙ্গীত-সঙ্গৎ মুসলমানগণ যেরূপ করিতে পারে, সেরূপ আর কোন জাতি পারে না এবং এ সকল বিষয়ে পশ্চিম প্রদেশীয় মুসলমানগণই বংশানুক্রমে দক্ষ। কাজেই ধনী অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালী পরিবারে উর্দুভাষী মুসলমান বাবুর্চি, ওস্তাগর, ড্রাইভার ও গানের ওস্তাদের যেমন সমাদর তেমনি অবাধ গতিবিধি। কোথাও কোথাও তাহারা গুরুঠাকুর অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস ও বিনয়বচন লাভ করে। কোন কোন পরিবারে মেটিয়াবুরুজের বাঁধা ওস্তাগর হন্ হন্ করিয়া অন্দর মহলে গিয়া হাজির হয়; বাড়ির বউঝিরা তাহাকে মাছির ন্যায় ছাঁকিয়া ধরে। শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও গায়ের মাপ লইবার তাহারা অবাধ অধিকার পায়। তাহাতে কক্ষরক্ষিত বিধবার পানীয় ও অসূর্যম্পশ্যার সুকুমার দেহ—কোনটাই অপবিত্র হয় না।

বিধর্মী বাবুর্চি ও ড্রাইভার ধনিগৃহের ছেলেমেয়েদিগকে বহু ক্ষেত্রে কুশিক্ষা দেয়—কুপথে পরিচালিত করে। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে উহাদিগের দেহে রতিজ ব্যাধি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছু উচ্চ ধারণা পোষণ করিবার কারণ ঘটিয়াছে। কয়েকজন প্রসিদ্ধ ও অর্ধপ্রসিদ্ধ প্রৌঢ়বৃদ্ধ মুসলমান গাইয়ে ও বাজিয়ে ওস্তাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপপরিচয়ের ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত গূঢ় জীবনের আদ্যোপান্ত জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে আমার। ইঁহারা প্রায় সকলেই অন্ধ গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরামিষাশী ও আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। কেহ কেহ আনুষ্ঠানিক গৃহস্থ ছিলেন, একমাত্র পত্নী ও পুত্রকন্যাদের প্রতি চির অনুরক্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই কোন নেশা করিতেন না। কেবল একজন মাত্র মদ্যপায়ী ও একজন শেষবয়সে অহিফেনসেবী ছিলেন।

বহুদিন পূর্বে একবার একজন যুবা সেতার-শিক্ষক তাহার ছাত্রীকে লইয়া পলাইয়াছিল আজমীরে। বৎসর খানেক পরে তাহারা ধরা পড়ে। মেয়েটি ইতোমধ্যে গর্ভবতী হইয়া পড়িয়াছিল। মামলায় প্রকাশ পায় যে, মেয়েটির পিতামাতা ইহাদিগকে একাকী থাকিবার ও বেড়াইবার অখণ্ড অধিকার দিয়াছিলেন এবং মেয়েটি ওস্তাদকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত। দুইটি তরুণ হৃদয় দিনের পর দিন একান্তে ঘনিষ্টভাবে মেশামিশির ফলে যদি প্রণয়াকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দোষ দিব কাহাকে? পলাইবার মতলব মেয়েটির মনে প্রথম জাগে এবং ফুসলানি ও উত্তেজনা তাহার তরফ হইতেই বেশী আসে। ওস্তাদ তাহাকে ধর্মান্তরিত করিয়া বিবাহ করে। মেয়েটি নাবালিকা প্রমাণিত হওয়ায় ওস্তাদের কঠোর সাজা হয়, মেয়েটি কোন আশ্রমে স্থান পায়।....

যাহাহউক, ঐ সকল ওস্তাদদের কেহ কেহ উদারনৈতিক হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত পরিবারে বাঁধা ওস্তাদরূপে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের বেতন ও অন্নভোগ করিয়াছেন; বহুকাল ধরিয়া বাড়ির ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূদিগকে গান-বাজ্‌না শিখাইয়াছেন। তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ইহাদিগের সহিত গুরুর গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষা করিয়া এবং প্রলুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ঘটিলেও আত্মদমন করিয়া চলিয়াছিলেন।

কোন মুসলমান ওস্তাদ কয়েকটি ভদ্রপরিবারে গান ও স্বরোদ শিক্ষা দিতেন। গুটি কয়েক কুমারী ও কুলবধূও তাঁহার শিষ্যা ছিল। যে উদারচরিত ধনীর বাড়িতে তিনি খাইতেন ও থাকিতেন, সেই বাড়িরই কোন বধূ একবার তাঁহার সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার ও দুই সহস্রাধিক নগদ টাকা লইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে লুকাইয়া তাঁহার কক্ষে আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া তুলেন এবং স্বামিপুত্রকন্যা ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার সহিত গৃহত্যাগ করিবেন বলিয়া গায়ককে প্ররোচনা দান ও প্রলোভন প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরদিন তিনি দেশে যাইবার অছিলায় জন্মের মতো প্রভুগৃহ ত্যাগ করিয়া আসেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি কোন হিন্দুগৃহে ওস্তাদরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পাড়ার গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলেরা সে সংবাদ জানিয়াও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে নাই; তিনি দারুণ উদ্বেগের সময়ও নির্ভয়ে পাড়ার মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন।

হিন্দু গাইয়ে-বাজিয়েদের অনেককেই জানি, অনেকের সহিত পরিচয় আছে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ ও সত্যকারের সঙ্গীতসাধক, তাঁহাদের অনেকেরই যৌবন কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও সংযমের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে জানি। আধুনিক গানবাজ্‌নার তরুণ কাণ্ডারী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সচ্চরিত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু বাকিগুলি শুধু

অসচ্চরিত্র নহে—নানাবিধ নেশায় আসক্ত, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিলাসী ও অপব্যয়ী। গানবাজনাকে ইঁহারা যেন আয়ত্ত করিয়াছে রূপসী তরুণীদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য ও নিজেদের পাপ-বাসনা মিটাইবার জন্য। বিভিন্ন রুচির সর্বদেশের নারীর গান ও গাইয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক মোহ আছে—তাহা ইহারা ভাল করিয়া জানে। যাহারা বিবাহ করিয়াছে এবং যাহারা করে নাই, তাহাদের কেহ কেহ ভদ্রঘরের যুবতী কন্যা ও বধূদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে প্ররোচিত করিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিরু গোঁসাইয়ের ন্যায় ফুসলাইয়া গৃহের বাহির করিয়াছে। কেহ কেহ দূষিত ব্যাধি দিয়াছে, কেহ কেহ গর্ভোৎপাদন করিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে। ক্বচিৎ কেহ ছাত্রীর সহিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ধরা পড়িয়া তাহাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে।

গ্রামোফন, সিনেমা ও রেডিওর কোন বিখ্যাত গায়ক কিছুকাল পূর্বে তাঁহাপেক্ষা বহুলাংশে বয়ঃকনিষ্ঠা এক ছাত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একজন কমিক গায়ক ও অভিনেতাও প্রৌঢ় বয়সে স্ত্রী-বর্তমানে এক মুগ্ধা কিশোরী শিষ্যার পাণিপীড়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অল্প কয়দিন হইল প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশীয় এক স্বরোদ ও ব্যাঞ্জো-বাদক শিক্ষিত ভদ্রলোক জনৈক সদ্গোপবংশীয়া সুন্দরী শিষ্যার প্রেমে মজিয়া পরিশেষে তাহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রধানত ছাত্রী-শিক্ষককে উপলক্ষ্য করিয়াই আজকাল চতুর্দিকে অসবর্ণ বিবাহের ধুয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। বিবাহ করিয়া ইঁহারা সুখী হউন—আমাদের তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু যাহারা ভদ্রগৃহস্থের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অমর্যাদা করিয়া তাহাদের সরলবুদ্ধি কন্যাদিগকে প্রলুব্ধ, কলঙ্কিত ও বিপন্ন করে, তাহাদের প্রতি শুধু আমাদের কেন—কাহারো সহানুভূতি থাকিতে পারে না। আবার, যাহারা

কোন ছাত্রীকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে সুখেস্বচ্ছন্দে রাখিতে অবহেলা করে এবং নেশাভাঙ্ করিয়া অন্যান্য ছাত্রী ও অছাত্রীকে লইয়া দিবারাত্র প্রমত্ত থাকে, তাহাদিগকে কোনমতেই ক্ষমা করা চলে না।

সঙ্গীত-শিক্ষালয় ও তাহার স্বরূপ

কলিকাতা ও বাংলার অন্য কয়েকটি বড় শহরে নৃত্যগীতবাদ্য-শিক্ষার অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। তাহা ব্যতীত কোন কোন বালিকা-বিদ্যালয়েও একটি সঙ্গীত-বিভাগ থাকে। কোন কোন সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পৃথক 'বাস' আছে এবং বহু ধনী ও জ্ঞানী পৃষ্ঠপোষক আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন দুইদিন বা ততোধিক দিন যোগ দেওয়ার অনুপাতে বিভিন্ন হারের মাহিনা স্থির করা আছে এবং তাহা পরিমাণে অধিক নহে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতৃগণ প্রায় সকলেই পুরুষ, ক্বচিৎ কোথাও দুই-তিনটি মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিয়মরক্ষার জন্য থাকেন। এই সকল বিদ্যালয়ের কোন কোনটার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের কথা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। এই-গুলিতে মেয়েরা শুধু নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখে না, সঙ্গে সঙ্গে শেখে বেণী-বিন্যাসের ও দেহ-সজ্জার নব নব বিলাসপারিপাট্য, আত্মবিজ্ঞাপনের আড়ম্বর, ঠোঁট-ভরা বাঁকা হাসি, চোখভরা আবেশবিহ্বলতা, বুকভরা তাচ্ছিল্য ও ছলনা; সর্বোপরি শেখে ফ্লার্টেশনের সর্বপ্রকার আধুনিক কায়দাকানুন। অধিকাংশ কলা-শিক্ষালয়ের ক্লাস বসে বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে। সকল মেয়েই শিক্ষালয়ে যায় সময়মতো, কোন কোন মেয়ে ফেরে প্রায়ই অসময়ে। এজন্য গৃহের কেহ বড় একটা কৈফিয়ৎ তলব করেন না, করিলেও নূতন নূতন গল্প রচনার অভাব হয় না।

এখানে শুধু শিক্ষকদের সহিত নহে, নিত্য আগন্তুক শিক্ষক-

বন্ধুদের সহিত, সমাজমান্য পৃষ্ঠপোষকদের সহিত আধা-প্রকাশ্যভাবে অবাধে ফ্লার্টেশন চলে। শিক্ষকদের লইয়া ছাত্রীদের মধ্যে হাসাহাসি রেষারেষি চলে, খোলাখুলি ভাবের আদানপ্রদান চলে, ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি চলে। এখানে প্রেম যত হয়, প্রেমের অভিনয় হয় তদপেক্ষা বেশী। প্রণয় যত হয়, পরিণয় তদপেক্ষা হয় অনেক কম। প্রতিবেশী ও অভিভাবকদের খরদৃষ্টি, সন্দেহ ও ভর্ৎসনার বাহিরে আসিয়া অনেক মেয়ে সামাজিক শালীনতা স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন দেয় এই সকল সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে। আর কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায়, কেহ কৌতূহলী হইয়া বা কেহ দলে পড়িয়া যাহা বিসর্জন দেয়, তাহার উচিত মূল্য কলা-শিক্ষার উচ্চস্তরে উঠিয়াও বুঝিয়া পায় না। অনেক সময় আত্মসমর্পণ তাহাকে একবার একজনের নিকট নয় বহুজনের নিকট করিতে হয়। গুরুর নিকট দক্ষিণা দিতে দিতে শেষে পাঁচজনের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিতে শিক্ষা করে, এবং অনেক ক্ষেত্রে দানের আগেই। শুধু বিরামহীন চঞ্চলতা, চিন্তাহীন রসোচ্ছলতা, লজ্জাহীন সজ্জা-কুশলতা, উদ্দাম গীতি-গন্ধ-glamour, বাহবা, ব্যাজস্তুতি, ফুলের তোড়া, মেডেল, ফটোপ্রকাশ, টীপার্টি, পিক্‌নিক্, চ্যারিটি-শো ও vanity।

কলাবিদ্যাশিক্ষার পরিণাম

কেহ বিপথ হইতে ফিরিয়া অনুশোচনা করে সারাজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া অথবা স্বামিগৃহে গিয়া। কেহ নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে নরকপুরীর শেষ রঙমহলে আসিয়া প্রবেশ করে এবং পুরুষের পর পুরুষকে সারাজীবন প্রমত্ত ও বঞ্চিত করিবার সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখে। কেহ ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানে, কেহ পেশাদারী বা আধা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে, কেহ মেসাজ্ ক্লিনিকে যোগ দেয়। কেহ নার্স হয়, কেহ প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী

হয়, কেহ লেডি টাইপিস্ট্, কেহ সঙ্গীতশিক্ষয়িত্রী—কেহ কমিউনিস্ট হয়, কেহ ক্যানভাস্ করে—বন্যাদুর্ভিক্ষবাস্তুত্যাগের চাঁদা সাধে ; কেহ হাসপাতালে যায়, কেন অনাথাশ্রমে ঢুকে। ক্বচিৎ কেহ লোভে পড়িয়া সাধ করিয়া বা পিতামাতার চাপে পড়িয়া বিবাহ করে; করিয়া, হয়তো নিজেও অসুখী হয়—স্বামী-গৃহকেও উদ্ব্যস্ত করে।

কলাকুশলাভিলাষিনী কন্যার পিতামাতা শেষ পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় নির্বিকার থাকেন ; কিছু বিপদ ঘটিলে অদৃষ্টকে ধিক্কার পাড়েন অথবা টাকার তোড়া লইয়া ডাক্তার ও ধাত্রীর পায়ে পড়েন। কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, বিদ্যালয়ে গিয়া মেয়ে যতই গান শিখুক না কেন, বিবাহের পণ তাহাতে হ্রস্ব হইবে না, তাহার রূপের চুল-চেরা বিচার-প্রবৃত্তি তাহাতে প্রশমিত হইবে না। শ্বশুরালয়ে কলাবিদ্যার আদর দুইদিনের জন্য হাতা-খুন্তি-চাম্‌চে-সাঁড়াশি-জাঁতি-বাঁটি-ঝিনুক-বাটির তালে তালে যে গান গাহিতে হয়, তাহার আদর শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। মেয়ের ইহকাল ও পরকাল খাওয়ার নিমিত্তকারণ হন অনেকক্ষেত্রে পিতামাতা নিজে। তাঁহাদের প্রাচীন দেহের অন্তরালে যে অর্বাচীন আশাকাঙ্ক্ষা দুষ্প্রবৃত্তি মুখ লুকাইয়া থাকে, সেগুলিকে তাঁহারা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে সঞ্চারিত করিয়া দেন —প্রস্ফুটিত হইতে দেন আপন পুত্রকন্যার মধ্যে।....

অভিভাবকদের শিক্ষাদান ও পালন-পদ্ধতির ত্রুটি সম্বন্ধে আমরা অতঃপর আরো আলোচনা করিব ; এত সহজে এ বিষয়ের ইতি করা চলিবে না।

==তৃতীয় আলোচনা==

ঘরে-বাইরে শিক্ষক ও হোষ্টেল

এই অধ্যায়ে কিছুক্ষণের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কথা লইয়া আর একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। বিদ্যালয়-শিক্ষক ও গৃহ-শিক্ষকদের সম্বন্ধে বক্তব্যের অনেকখানিই আমি ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। সে সম্বন্ধে বলিতে যৎসামান্যই বাকি আছে।....

এই তথাকথিত সভ্যতা আমাদের ধার করা নয়, নিজেদের গড়া। সভ্যদেশে মধ্যবিত্তের ঘরে প্রাইভেট টিউটর নামধেয় কোন বিশেষ অবশ্যরক্ষণীয় জীব একপ্রকার অজ্ঞাত বলিলেই হয়। পড়া তৈয়ারি করাইয়া দিবার ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবার কাজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের নিত্যকৃত্যের অন্তর্গত। বড় জোর সেখানে কোচিং ক্লাস থাকে—পশ্চাদ্বর্তী ছেলেমেয়েরা সেইখানে অতিরিক্ত সাহায্য ও যত্ন পায়। ডিউক, কাউন্ট, আর্ল, ব্যারন্ বা কোটিপতি ব্যবসায়ীরা গৃহে কখনো কখনো Resident tutor রাখেন মোটা মাহিনায় ; মধ্যবিত্তের ঘরে ইহারা প্রাংশুলভ্য ফল। বিলাতে ও কন্টিনেণ্টে বহু আবাসিক বিদ্যালয় আছে—ছেলেদের জন্যও বটে, মেয়েদের জন্যও বটে। সেখানে প্রাইভেট্ টিউটরের পশ্চাতে নিরর্থক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। বোর্ডিং-বাসিন্দা শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদিগকে বিনা-পারিশ্রমিকে পড়া বলিয়া দেন। তাহা ছাড়া সেখানকার ছোট ছেলেদের বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষয়িত্রী ও প্রধানশিক্ষয়িত্রী বরং আছেন, কিন্তু কুত্রাপি ভারতের মতো কিশোরী ও যুবতীদের বিদ্যালয়ে পুরুষশিক্ষক রাখার বিধিবিধান নাই।

মাস কয়েক মাত্র পূর্বে এক গৃহশিক্ষক ছাত্রীহরণের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দায়রার বিচারে আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত অরুণ মুখোপাধ্যায় সচ্ছল শিক্ষিত সহৃদয় গৃহস্থ। বৎসরাধিক কাল পূর্বে সমর দাশগুপ্ত নামক একটি দরিদ্র যুবককে তিনি স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া, তাহার উপর তাঁহার কন্যা মঞ্জু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পড়াইবার ভার দিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে অরুণ বাবুর অন্যতমা কন্যা প্রীতির বিবাহ হইবার কথা। প্রীতির মাতা সমর মাস্টারকে বলেন বিবাহে ব্যবহার্য একখানা সাড়ি কিনিয়া আনিবার জন্য। সমর টাকা লইয়া বলে—আমি পছন্দসই সাড়ি কিন্‌তে টিন্‌তে পারব না। শেষে কি আনতে কি আনব! তার চেয়ে মঞ্জু আমার সঙ্গে চলুক, ও দেখে-শুনে পছন্দ কোরে কিনে আনবে'খন।

প্রীতির মা মঞ্জুকে মাস্টারের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। মঞ্জুর বয়স তখন এগার বৎসর মাত্র। দিনের বেলায় মাস্টারের সহিত দোকানে যাইবে—ইহাতে আর আপত্তি কি কারণ থাকিতে পারে? এমন তো কতবার গিয়াছে! ঐ তো একরত্তি মেয়ে! আর সমর তো তাঁহাদের বাড়ির ছেলের মতো।....কিন্তু দুইতিন ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল তাহারা ফিরিল না। বাড়ির সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িল। হাস-পাতালগুলিতে খবর লওয়া হইল; শেষে থানায়ও ডায়ারি করানো হইল। কিন্তু সেদিন বা তাহার পরদিনও তাহাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। বিবাহের আনন্দ-উৎসব নিমেষে স্তিমিত হইয়া গেল; সজল-নয়নে সকলে মঞ্জুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া মাসাধিক কাল চলিয়া যায়, মঞ্জু ফেরে না।

সমর মঞ্জুকে লইয়া কাপড়ের দোকানে আদৌ যায় নাই, তাহাকে জোড়াসাঁকোয় এক বাড়িতে লইয়া যায়। সেখানে তাহারা দিন

কয়েক পতিপত্নীর ন্যায় যাপন করে। সেখান হইতে সমর তাহাকে ফরিদপুর জেলায় নিজ গ্রামে লইয়া যায় এবং আত্মীয়স্বজনের নিকট তাহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচিত করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে যে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী নহে—একথা এই সরলস্বভাবা নাবালিকা মেয়েটি জোড়াসাঁকোর বাসায় বা গ্রামে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। মামলার সময় বোধ করি এমন কথাও প্রকাশ পায় নাই যে, তাহার হাতে-পায়ে সমর বেড়ি দিয়া কোন ঘরে দিনরাত আটক করিয়া রাখিয়াছিল, অথবা মঞ্জুর পিত্রালয়ে একখানা পত্র লেখার গোপন সুযোগকে সে সর্বপ্রকারে প্রতিহত করিয়া দিয়াছিল; অথবা তাহার কবল হইতে পলাইবার সে আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিল।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে সমর মঞ্জুকে পুনরায় জোড়াসাঁকোর বাসায় আনিয়া রাখে এবং নিয়ত তাহার সহিত স্বামিবৎ ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিতে থাকে। দিন কয়েক পরে এই স্থান হইতে পুলিস সমরকে গ্রেপ্তার ও মঞ্জুকে উদ্ধার করে। আইনের চক্ষে মঞ্জুর সহবাস-সম্মতির বয়স হয় নাই সত্য, কিন্তু এই অপহরণ ও ধর্ষণ ব্যাপারে মঞ্জুর আদৌ পরীপ্সা ও সম্মতি ছিল কিনা, তাহা জজ, জুরি ও মামলার পরিদর্শকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং পাঠকপাঠিকাগণেরও অনুমান করিতে বিলম্ব হইবে না। এই একটি ঘটনা হইতেই আমরা এই নীতিশিক্ষা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিতে পারি যে, গৃহশিক্ষকের হস্তে দশ-এগারো বৎসরের কন্যাদিগকেও ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বাস নাই এবং এদেশের কচি বালিকার মনেও দাম্পত্য আচরণ সম্বন্ধে কল্পনা, এষণা ও কৌতূহল জাগানো খুব কষ্টসাধ্য নয়।

প্রধানশিক্ষকের শয়তানী লীলা

শিক্ষিকা বা শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু সমস্ত বলিবার হয়তো জায়গা পাইব না; যতটা পারি প্রসঙ্গক্রমে

একটু পরেই বলিব। এখন বাংলার কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত করিয়া দিতে চাই। ইহাতেও যাঁহাদের চেতনা হইবে না, তাঁহাদের জন্য এ বই নয়।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন নৃশংসতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তখন অখণ্ড বাংলার কোন স্থান হইতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক তরুণীর একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাই। স্থানটি অবশ্য ভাগীরথীর পূর্ব পারে নয়, পশ্চিম পারে। কোথায়, কলিকাতা হইতে কতদূরে বলিব না।...জীবনে বিস্ময় ও জুগুপ্সা-উদ্রেককর বহু ঘটনা শুনিয়াছি, বহু বস্তু দেখিয়াছি, বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু এই পত্রোক্ত ঘটনার বিবরণ আমাকে কিছুক্ষণ নহে—বেশ কিছুদিন ধরিয়া বিমূঢ় ও হতভম্ব করিয়া রাখিয়াছিল। ঠিক অনুরূপ ঘটনার নথী আমার দপ্তরে ইতঃপূর্বে কখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। প্রথম অভিভূতির প্রাখর্য কাটিয়া যাইবার পর স্থিরমস্তিষ্কে ভাবিতে লাগিলাম, বিদ্যালয়ের একজন প্রধানশিক্ষকের পক্ষে এরূপ ক্লেদাক্ত কদাচরণ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? অথবা মেয়েটির কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে? এরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কি করিয়া এতকাল একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষদেশে বসিয়া থাকিয়া নিরঙ্কুশভাবে এই দুর্নীতিকর অভিযান চালাইতে পারে? আরো ভাবিতে লাগিলাম, বাংলাদেশে পুলিসের ব্যাটন, সতর্কচক্ষু ও নিরপত্তা আইন, পাড়ার হিতচিকীর্ষু দুর্ধর্ষ ছেলেদের হকিস্টিক্ ও লাঠি, সন্ত্রাসবাদীদের পিস্তল-বোমা কি শিক্ষালয়ের এই সব বর্ণচোরা কুমারীধর্ষণকারীদের সায়েস্তা করিতে অশক্ত?

এই পত্রোক্ত ব্যক্তিটি সত্যই রক্তমাংসের শরীরে বর্তমান আছে কিনা, সত্যই বর্ণনানুরূপ জঘন্য চরিত্র তাহার কিনা এবং

পত্রলেখিকা স্বাভাবিক প্রকৃতির ও সত্যভাষিণী কিনা—তাহা জানিবার ঔৎসুক্য সে সময় আমার প্রচুর হইয়াছিল; কিন্তু সেই ঘোর অরাজকতা ও আতঙ্ককর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঔৎসুক্য মিটাইবার সুযোগ ও শৈলী পাই নাই। বৎসর খানেক পরে স্থানীয় লোকেদের নিকট হইতে কিছু কিছু খোঁজখবর যোগাড় করিয়া অনুসন্ধিৎসা কথঞ্চিৎ মিটিয়াছিল বটে, সম্পূর্ণ মিটে নাই। পত্রে ভাবাবেগজনিত অসঙ্গতি ও কিছু অতিশয়োক্তির মিশ্রণকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়া ও উহার প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকখানি নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, উহা প্রায় আমূল নিম্নে অধ্যাহার করিয়া দিতেছি। উহার স্থানে স্থানে শালীনতার খাতিরে দুই-চারিটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া এবং তাড়াতাড়িতে পড়িয়া-যাওয়া দুই-একটি শব্দ যথাস্থানে বসাইয়া দিয়াছি। দুই চারিটি ঘোর আপত্তিকর ও অনাবশ্যকীয় স্থান উহ্য রাখিতে বাধ্য হইলাম।

"...আমার বয়স ২৫, বর্ত্তমান কলেজের ছাত্রী। অদ্যাবধি অবিবাহিতা। আধুনিক আবহাওয়ার ভিতর সর্বপ্রকারে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি আপনার পুস্তকাদি একখানিও পড়ি নাই। বর্ত্তমান মাস দুই আগে আমি খান কয়েক বই পড়িয়াছি।....

"জীবনে চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে ১ বার ৬২ বছরের বৃদ্ধের সহিত স্কুলে পড়িবার কালে। তিনি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন, B. A. পাস, ৬২ বছর বয়স, অথচ কি পঙ্কিল মনোবৃত্তি! আমার কুমারী-জীবনকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। শুধু আমাকে কেন, বড় বড় মেয়েকে লইয়া সতীত্ব নাশ করে। ঈশ্বরের নিকট আমি তার মৃত্যু-কামনা করিতেছি। ২০ বছর বয়সে আমায় স্কুলঘরে একাকী পাইয়া বলপূর্বক টেবিলে শোয়াইয়া সতীত্ব নাশ করে। এর

আগে আমায় গোপনে বলে, তোমায় কোশ্চেন্ ব'লে দেব, তুমি আমার বসিবার ঘরে আসিও। সকল মেয়ে ছুটির পর যাইবার কালে আমাকে ডাকে নাই, উপরন্তু চোখ টেপাটিপি করিয়াছিল। আমার অদৃষ্টে এ কলংক আছে কে মুছিবে। সেই নরপিশাচের নাম....., ...নং.....রোডে থাকে। সেদিন বোধহয় দারোয়ান্ ও ঝিকে ঘুস দিয়াছিল। কারণ চেঁচাইবার চেষ্টা করাতে বলিয়াছিল, সে পথ বন্ধ, আধঘণ্টা পরে ছেড়ে দোব, ভয় কি। আমি তাহার সহিত জোরে পারি নাই।....

বিভিন্নপ্রকার করিয়া আমার দেহ উপভোগ করিল। কিন্তু প্রথম যখন —প্রবেশ করাইল, ভীষণ লাগিয়াছিল সে সময়।...তারপর আর লাগে নাই, রক্তও পড়ে নাই। যতবার — ত্যাগ করিয়াছে ততবার মাটিতেই নিক্ষেপ করিয়াছে।....আধ ঘণ্টা পরে ছাড়িয়া দেয় ও করুণ কণ্ঠে বলে, রোজ এস, লক্ষ্মীটি। আর আমি — সব বাইরে ফেলেছি। তোমার যাতে অনিষ্ট হবে এমন কর্ব না। ওই ত — সিংহ, —ঘোষ, —মুখার্জি সব মেয়েরাই আমার অনুগত। এটি যে নূতন নূতন পথে — চায় রোজ; দেখনা এর মধ্যেই — জন্যে কেমন তৈরী হয়েছে। বলেই আমায় জড়িয়ে ধর্‌তে আসে পুনরায়।

"আমি তখন এমন অবসাদগ্রস্ত, এমন ক্লান্ত যে, কাঁচের গ্লাসটি ছুঁড়ে মারব সে ক্ষমতাও নেই। কাপড়চোপড় সামলে মন্ত্রাবিষ্টের মত দরজা খুলে পালাবার জন্য পা বাড়াব, পুনরায় আবার জড়িয়ে ধ'রে বলে, এখনো ঢের বেলা, বাড়ীতে গিয়ে ব'লো যে স্কুলে পেয়ারা খাচ্ছিলাম। এ ত পেয়ারার চেয়ে মিষ্টি।....কি বল, রাজী ত? ব'লে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই — আরম্ভ কর্ল! সমস্ত রক্ত আমার তখন মাথায় চড়েছে। কোন ক্ষমতা যেন নেই, দেহ যেন

শূন্যে ভাস্‌ছে। এমনি অবস্থা, তবু কি জানি, দয়া করেই বোধহয় দোর নিজে খুলে আমায় হাত ধরে গেট্ অবধি পৌঁছে দিলে।

"আমি টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী এসে নিজের পড়ার ঘরে এসে লুকিয়ে শুয়েছিলুম। ঘুম ভাঙ্‌ল সন্ধ্যাবেলা। নিজেকে যথাসম্ভব সামলে বাড়ীর ভেতর গেলুম। মা অনুযোগ কর্লেন, স্কুল থেকে এসে খেলি না কেন, নে কাপড় ছাড়্, খা। এই পর্য্যন্ত, ব্যস। কারো লক্ষ্য নেই আমার মুখ কেন ভূতের মত কালো দেখাচ্ছে; কেন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি কেউ বুঝতে পারছে না। ডাক ছেড়ে তখন কান্না পাচ্ছিল। আমি গানের মাস্টারকে বিদেয় দিলুম মাথা ধরেছে ব'লে। দাদা খানিকটা স্মেলিং সল্ট্ দিয়ে চলে গেলেন। যেন কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। সংসার যেমন চলে, তেমনি কলরবে চলতে লাগ্‌ল। আমার ভেতর যে পুড়ে যাচ্ছে তা কেউ দেখ্‌ল না।

"অনুতাপে সারারাত কাঁদলুম—এই পর্য্যন্ত; বাঙ্গালীর মেয়ের যা শেষ কাজ কান্না। এর পর সকালে উঠেছি, বেড়াতে গেছি, গলা সেধে গান করেছি। বৌদিদের সাথে চান্‌ঘরে হুল্লোড় ক'রে চান্ করেছি। যেন আমার কোন সর্বনাশই হয়নি।....কিন্তু স্কুলে আর যাইনি।

"এখনও —বাবু আমাদের বাড়ী আসেন বাবার কাছে, কি ভেবে কে জানে। চাকর চা নিয়ে যায়, মনে হয় বিষ মিশিয়ে দি, আপদ চুকে যাক্। কিন্তু বিষ কোথায়, কে এনে দেবে? তাহলে ত নিজের কালীমাখা দেহটাই শেষ করি। গ্লানিতে সারা দেহ তিল তিল ক'রে পুড়ে যাচ্ছে। উপায় নেই। ৬২ বছরে ওর ....অসম্ভব ইন্দ্রিয় চালনার শক্তি। ১৫।১৬ থেকে ২০।২৫ বছর বয়সের যুবতীকে ও ঠাণ্ডা করে দ্যায়। নূতন শিক্ষয়িত্রী এলে

মেয়েরা তখন বন্ধ থাকে। এমন কিছু যাদুমন্ত্র ও জানে যে, কেউ ওর বিরুদ্ধবাদী হয় না। আমি একলা ওকে জব্দ করব কি ক'রে? স্কুলে অত মেয়ে, কেউ স্বীকারই করে না যে, —বাবু চরিত্রহীন, পশুতুল্য। আমার একলার ক্ষমতা কতটুকু!

"—মেয়েটি স্কুলে সম্ভোগ-বাসনা ইচ্ছামত মেটে না ব'লে সন্ধ্যাবেলা —বাবুর কাছে পড়তে যায়। —বাবুর স্ত্রী আছে, চোখে কম দেখে, স্থবির গোছের। তাই —বাবুর শতাধিক স্ত্রী বাঁধা। পুত্রবধূ কাছে থাকে না শ্বশুরের কুৎসিত লালসার জন্যে। কিন্তু এমন সাবধানী গর্ভ কারুর হয় না। সেইজন্যই মেয়েদের সাহসটা বেড়ে গেছে। ক্লাসে একঘর মেয়ের সাম্‌নে অংশবিশেষ অসংবৃত ও উচ্ছ্রিত ক'রে রাখ্‌তেন। মেয়েরা পড়া দিতে যেত, মেয়েদের হাত টেনে নিয়ে উক্ত স্থানে চেপে ধরতেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কেউ সামনে পড়্‌লেই বুক চেপে ধরতেন। এত গুণ ভদ্রলোকের।....

"এখন আসল কথা এই যে, আমি আজ ৫ বৎসর নিদারুণ কষ্ট পাইতেছি, কাহাকেও বলিবার নয়।....আপনাকে জানাইতে অগ্রসর হইলাম। সহবাসের পর হইতে সুরু হইয়াছে। সহবাস করিয়াছি সেই ৫ বৎসর আগে পৌষের এক স্মরণীয় দিন, মঙ্গলবার।...অদ্যাবধি আমি যোনীনালীর মুখের জন্য নিদরুণ কষ্ট পাই। রোগটি লজ্জাজনক। ঠিক জননেন্দ্রিয়ের মুখ ও চতুঃপার্শ্বে এমন চুলকাইবে যে পাঁচজনের সামনে বসিয়া থাকাও দুষ্কর, অথচ ঔষধও কিছু নাই। চানের ঘরে যাইয়া অভিভূত অবস্থায় চুলকাই। আধঘণ্টা পরে সে স্থান ভীষণ ফুলিয়া ওঠে ও প্রস্রাব বাহির হয় না। ফুলিয়া মুখ বন্ধ। সপ্তাহে একবার এইরূপ চুলকায়। ফোলা অবস্থা প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা থাকে।....প্রস্রাবের সাথে রোজই বেশ খানিকটা থল্‌থলে সাদা পদার্থ বাহির হইয়া যায়। সর্বদা লালার ন্যায় যোনি দিয়া বহির্গত হয়।

বিশ্বাস করিবেন এ সমস্ত সত্য। উত্তেজনাও কখনও কখনও অতিমাত্রায় আসে ও অস্থির করিয়া তোলে; তখন যোনিপথ দিয়া রসবৎ দ্রব্য গড়াইয়া পড়ে। ইহার প্রতিকার কি বিবাহ? কিন্তু বিবাহ এখন অভিভাবকেরা দিবেন না, —পড়াইবেন বলিয়াছেন।

"—নাথ বর্তমানে এক ছাত্রীকে লইয়া পুরী গিয়াছেন ৩।৪ দিনের ছুটি লইয়া। তাঁহার ঠিকানা দিয়াছি। তাঁহাকে, আমার অনুরোধ, একখানা পত্রাঘাত করিবেন। ঠিকানা আর তিনটি মেয়ের দিতেছি; উহাদিগকে চরিত্র সংশোধনের জন্য শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত দিয়া পত্র দিবেন। তাহারা বড় পিছল পথে পা দিয়াছে। তাহারা এককালে আমার বান্ধবী ছিল। সেজন্য মায়া লাগে এই অল্পবয়সে অবনতি দেখিয়া। নমস্কার লইবেন।"...

পুরুষশিক্ষক পোষার অনিষ্টকারিতা

এই তথ্যসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ পত্র পড়িয়া পাঠকগণ কি ধারণা করিবেন জানি না; কিন্তু অতঃপর বিদ্যালয়ের পুরুষশিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে স্বীয় কন্যা-ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে ছাড়িয়া দিবার পূর্বে একটা অনিষ্টকর সম্ভাবনীয়তার কথা অন্ততঃপক্ষে ভাবিয়া দেখিবেন! এই পত্রখানার কিয়দংশও যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধ শিক্ষকদের নিকট কন্যা পাঠাইয়াও বিশ্বাস করা চলে না—এই সত্যকে খানিকটা পরিমাণে না মানিয়া লইয়া উপায় নাই। সমস্ত পুরুষশিক্ষকই দুশ্চরিত্র অথবা কুমারী-সংস্পর্শে আসিলে তাঁহাদের মনে পাপপ্রবৃত্তি জাগে, একথা সদর্পে ঘোষণা করিবার মূর্খতা আমার নাই। অনেক যুবাবৃদ্ধ বিবাহিত অবিবাহিত শিক্ষক থাকিতে পারেন ও আছেন যাঁহারা ছাত্রীদিগকে আপন ভগ্নী ও কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন অথবা তাহাদের সান্নিধ্যে আশানুরূপ আত্মসংযম করিয়া চলেন। কিন্তু এ দুনিয়ায় চরিত্র বিষয়ে

কে ভালো কে মন্দ—তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা বাহ্য আচারব্যবহারাদি দেখিয়া যখন বুঝিবার উপায় নাই, দীর্ঘকাল সাধু জীবন যাপন করিতে করিতে কাহার কোন্ অশুভ ক্ষণে পদস্খলন হইবে—তাহা যখন পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করা যায় না, তখন মেয়েদের পুরুষ শিক্ষক ও ওস্তাদের সংস্পর্শে না আসিতে দেওয়াই সমীচীন। যেখানে পুরুষ ছাড়া শিক্ষক মেলে না, সেখানে হয় মেয়েরা লেখাপড়া ও গীতবাদ্য শেখা বন্ধ রাখুক, নতুবা বাড়িতে বসিয়া অভিজ্ঞ আত্মীয়স্বজনের শাক্‌রেদি করুক এবং নিজের প্রযত্নে যতটা পারে শিখুক। উপায় কি? চরিত্রের বিনিময়ে মেয়েরা যে শিক্ষা পায়, সে শিক্ষার সামাজিক ও সাংসারিক মূল্য যে কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

হোস্টেলে মেয়েদের জীবন ও শিক্ষা

তারপর হোস্টেলে মেয়েদের রাখিয়া পড়ানোর কথা কিছু বলি। বিদ্যালয় ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট আবাসে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে গিয়া যত ছেলে বিগ্‌ড়াইয়া যায়, তদপেক্ষা বেশী অধঃপাতে যায় মেয়েরা। একটা বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই শিক্ষাগ্রহণকার্য পারিবারিক আওতার মধ্যে সাধিত হওয়া উচিত—অবশ্য পারিবারিক পরিবেশ যদি স্নেহপ্রেমশান্তিপূর্ণ ও চরিত্রগঠনের সর্বতোভাবে অনুকূল হয়। তারপর একটা বয়সের পর ছেলের শিক্ষা পরিবার অর্থাৎ পিতামাতার প্রভাব হইতে দূরে হইলে ভাল হয় বটে, কিন্তু মেয়ের শিক্ষা দূরে হইলে সাধারণত ফল ভাল হয় না। একে তো আমাদের দেশে মেয়েদের বিদ্যালয়গত শিক্ষা পৌরুষপ্রধান ও অব্যবহারিক, তদুপরি তাহারা যদি ঐ শিক্ষা পরিবারের সুপরিচিত ও সুকুমার আবহাওয়ার বাহিরে গিয়া লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা নারীত্বের অনেক কিছু গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে সুযোগ পায় না, ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের

নিমিত্ত কোন দিক্ দিয়াই প্রস্তুত হইবার পথ পায় না, পুরুষের চেয়েও অধিক পরুষ ও বহির্মুখী হওয়ার সম্ভাবনাকে তাহারা আমন্ত্রণ করিয়া আনে।

হোস্টেলে তাহাদের ঘরগৃহস্থালির কাজ মুখ্যত দাসদাসী ও পাচকে করে। কলেজে যাওয়া ও লেখাপড়া করা ছাড়া আর তাহাদের কোন কাজ নাই। কিন্তু পড়ার ফাঁকে অবসর থাকে প্রচুর এবং সকলেই কিছু হোস্টেলে বসিয়া দিনরাত পড়াশুনায় মন দেয় না। গুটি কয়েক ভালো মেয়ে ছাড়া বাকি মেয়েগুলি খায়-দায়, ঘুমায়, সিনেমা-থিএটার দেখে, খেলার মাঠে কার্জন পার্কে ইডেন গার্ডেনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বমপাস্ লেকে চিঁড়িয়াখানায় বেড়াইতে যায়, নাটকোপন্যাস পড়ে, অভিনেতা-অভিনেত্রী-লেখক-লেখিকাদের আকৃতিপ্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম সমালোচনা করে, কংগ্রেস-সোস্যালিজ্‌ম্-হিন্দুসভা-কমিউনিজ্‌ম্ লইয়া বাদানুবাদ করে, মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের মিশ্রিত শোভা-যাত্রায় বা শোকযাত্রায় যোগ দেয়। কেহ কেহ নৃত্যগীত-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কেহ মাসিকপত্রে কবিতাপ্রবন্ধ লেখে। কেহ কেহ হোস্টেলের ছাত ও জানালা হইতে চারিপার্শ্বের বাড়ির যুবকপ্রৌঢ়দের প্রগল্‌ভ দৃষ্টি সকৌতুকে উপভোগ করে, কেহ সে দৃষ্টিকে প্রশ্রয় দান করে, কেহ তাহাদের সহিত পত্রবিনিময়—কেহ বা বাক্যবিনিময় করে, কেহ বা পূর্বনির্দেশানুযায়ী কোন প্রতিবেশী যুবকের সহিত ইডেন গার্ডেনে, রেল স্টেশনে বা হোটেলে গিয়া মোলাকাৎ করে,...কেহ কেহ নব-দম্পতিদের ঘনিষ্ঠতা লুকাইয়া লক্ষ্য করে ইত্যাদি।

কেহ বা তাহার পড়া কোন উপন্যাস বা নাটকের ভাল-লাগা কোন নায়িকার অনুকরণ করে। নতুবা কলেজের কোন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বা হোস্টেলের লেডি-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে লইয়া বান্ধবীদের মধ্যে বিদ্রূপ করিতে করিতে তাহাকে মনে মনে ভালবাসিয়া ফেলে। সর্ব দেশেই

লেডি-সুপারের মধ্যে কেহ কেহ সমকামী থাকেন এবং তাঁহাদের রক্ষণধীনাদের মধ্যে অনুরক্ত কাহারো সহিত সমরতিমূলক প্রণয়চর্যায় প্রবৃত্ত হন্। অধ্যাপিকাদের মধ্যে সমকামী কেহ কেহ থাকিলেও ছাত্রীদের সহিত প্রণয়চর্চার ক্বচিৎ সুযোগ পান। অধ্যাপকদের কেহ কেহ গৃহশিক্ষকতার সুযোগ পাইলে ছাত্রীদের প্রেমের প্রতিদান দেন, অথবা ছাত্রীদের কেহ কেহ অন্যবিধ কৌশলে অধ্যাপকদিগকে তাহাদের প্রেমের রেশমী জালে ধরিয়া ফেলে। এ ঘটনা অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও বহুতর ঘটে। কোন কোন বিবাহিত প্রবাসী অধ্যাপক ছাত্রীদের বেদন-ভরা প্রণয়নিবেদন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে ধন্য ও পরে ক্ষুণ্ণ করেন। আবার কোন কোন কলেজবিহারিণী আধুনিকী উমা একাধিক কটাক্ষবিভ্রমে শিবপ্রতিম অধ্যাপকের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া দিয়া তাহার গলায় বরমাল্য প্রদান করে। ইহাতে অবশ্য কন্যার অভিভাবকেদের লজ্জা ও পরিবেদনের কোন কারণ থাকে না, আমাদেরও আপত্তি করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু বিবাহ না হইলে, সকল দিক্ হইতেই অনুশোচনার কারণ ঘটে।

স্কুলকলেজ-সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত হোস্টেলে অধিবাসিনীদের কলেজের সময় ব্যতীত অন্য সময় হোস্টেলের বাহিরে যাইবার জন্য লেডি-সুপারের অনুমতি লইতে হয়; তাহাদের বাহিরে থাকিবার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সন্ধ্যার মধ্যে সকলকেই হোস্টেলে ফিরিয়া আসিতে হয়। কেহ সময়মতো প্রত্যাবর্তন না করিলে লেডি-সুপার তাহাকে ভৎর্সনা করেন, জরিমানা করেন, নতুবা প্রিন্সিপ্যালকে জানান্। প্রিন্সিপ্যাল্ তাহাকে কঠোরতরভাবে ভৎর্সনা করেন অথবা তাহার অভিভাবককে লিখিয়া জানান্। পুনঃপুন এরূপ হইতে থাকিলে, তাহাকে হোস্টেল্ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। অনেক হোস্টেলে সন্ধ্যা সাতটার সময় রোল্-কল্ করা হয়। মাঝে মাঝে দুই এক-

দিন বিলম্বে ফিরিলে অথবা দুই-পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইলে, মৃদুস্বভাবা লেডি-সুপার মার্জনা করেন। কিন্তু কোন কোন দুষ্টস্বভাবা হেস্টেল্-বাসিনী তাঁহার পক্ষপাতদুষ্ট স্নেহ অর্জন করিয়া বেশী বিলম্বে আসিয়াও তাঁহার তিরস্কারের হাত হইতে নিস্তার পায়।

লোক্যাল্ গার্জেন

হোস্টেলবাসিনীদের প্রত্যেকেরই একজন বা একাধিক লোক্যাল্ গার্জনের নামঠিকানা লেডি-সুপারের নিকট লেখানো থাকে। মফস্বল-বাসী আসল গার্জেন তাঁহাদের নামে আমমোক্তার দেন—মেয়েকে দেখাশোনা করা ও প্রয়োজনমতো হোস্টেলের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া লোক্যাল্ গার্জেন তাঁহার পরিদর্শনাধীন মেয়েকে নিজের গৃহে দুই-এক রাত্রি রাখিতে পারেন অথবা দীর্ঘ অবকাশ সুরু হওয়ামাত্র তাহাকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথবা মেয়েটি হোস্টেলে অসুস্থ হইয়া পড়িলে সুস্থতা লাভ না করা পর্যন্ত তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইতেও পারেন। লোক্যাল গার্জেন্ প্রায়ই কোন নিকট বা দূর আত্মীয় হন্, নতুবা অভিভাবকের কোন ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব হন্।

এই সকল লোক্যাল গার্জেন্ সকল সময় নিজেরা না আসিয়া প্রতিনিধি-রূপে তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয়কে হোস্টেলে পাঠান্ মেয়েকে দেখিবার বা আনিবার জন্য। মেয়েটি কাহার সহিত কতক্ষণের জন্য কি উদ্দেশ্যে বাহিরে যাইতেছে—তাহা ভিজিটর্স রেজিস্টারে লিখিয়া নাম সহি করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। উহারা প্রায় ক্ষেত্রেই হয় অবিবাহিত যুবক; কাব্য, রোমান্স্ ও কাম-কৌতূহল ইহাদের প্রাণে গজ্ গজ্ করিতেছে। লোক্যাল

গার্জেনের প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ইহারা নিজেদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হোস্টেল হইতে ছাত্রীদিগকে বাহির করিয়া আনে। তাহাদিগকে পাশে লইয়া সিনেমা-থিএটার-ম্যাচ দেখে, হোটেলে ঢুকিয়া সপরিহাসে জলযোগ করে। কখনো ইডেন গার্ডেনের নির্জন কুঞ্জান্তরালে লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে সিনেমাসঙ্গীত বা কাজীর গজল্ শুনায়। কখনো কখনো ইহাদের ধনী বন্ধুরা সঙ্গে জুটিয়া ইহাদিগকে মোটরে করিয়া আরো দূরে ভ্রমণে লইয়া যায়। কোন সময় তাহারা যথাসময়ে অথবা সময়াতীতে ফেরে; কদাচিৎ মোটর স্বস্থানে ফিরিয়া আসে—তাহারা ফেরে না।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানীয় অভিভাবকরূপী প্রৌঢ় পিতৃ বা পিতৃব্য-বন্ধুর নিকট কেহ কেহ নিজের কুমারীত্ব বিসর্জন দেয় এবং সময়ে অসময়ে তাঁহার উপকার ও উপহার পাইয়া এই দুষ্কৃতির ব্যথা ভুলিয়া থাকে বা চাপিয়া যায়। অবিশ্বাস করিবেন না,—তথাকথিত লোক্যাল্ গার্জেনের দ্বারা কোন কোন বালিকা শুধু ধর্ষিতাই হয় না, গর্ভবতী হয় অথবা রতিজ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন কলঙ্কের ব্যাপার পুলিস ও সাংবাদিকের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও হোস্টেলের সকলের নিকট এবং আসল অভিভাবকের নিকট আর ঢাকা থাকে না। হোস্টেল্ ও কলেজ হইতে সে অপসারিত হয়; পিতামাতা ও কন্যার চক্ষু হইতে কিছুকালের জন্য ঘুম চলিয়া যায়। ক্বচিৎ কখনো হোস্টেলকর্ত্রী নিত্যনৈমিত্তিক উপঢৌকন পাইয়া প্রমোদোপায়ন-প্রত্যাশী ছাত্রীদিগকে স্বধর্মী, বিধর্মী বা প্রদেশান্তরবাসী ধনাঢ্য লম্পটের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে, সম্ভবত এখনো দেয়। ধরা কয়জনে পড়ে—শাস্তি কয়জনে পায়?

হোস্টেলের তরুণী মেয়েদের একটা অনুপেক্ষণীয় অংশের বাক্স ও ডেস্ক তল্লাস করিয়া শুধু সিগারেট ও ফরাশী কার্ডই পাওয়া যায় না,

প্রমেহ রোগের পেটেণ্ট ঔষধ অথবা গর্ভসংরোধের বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামও পাওয়া যায়। কয়জন অভিভাবকই বা এ সংবাদ রাখেন অথবা শুনিলে কেই বা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন?....তবু সংসারের কাজ না শিখাইয়া মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া চাই। ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচ করিয়া তাহাদিগকে হোস্টেলে রাখা চাই!

কুমারী সুজাতার বিয়োগবিধুর জীবননাট্য

সুজাতার শোচনীয় জীবনকাহিনী আপনারা নিশ্চয়ই কিছুকাল পূর্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন এবং পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর আপনারা সে কাহিনীর প্রায় সমস্তটাই বিস্মৃতির পঙ্ককুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছেন, অনেকেই হয়তো তাহার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।....সর্বদেশেই সুজাতা ছিল ও আছে। তাহার বিয়োগবিধুর জীবননাট্যের শাশ্বত হইয়া বাঁচিয়া থাকা উচিত আমাদিগকে সুশিক্ষা ও সম্বিৎ দিবার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কাহিনীটি সংক্ষেপে শুনাইয়া দিতে চাই।...কাহিনীর প্রায় সমস্ত মালমশলাই এতৎসম্পর্কীয় মামলার বিচারে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজের রায় হইতে গৃহীত হইয়াছে।

কুমারী সুজাতা সরকার ধুবড়ির কোন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের সংশ্লিষ্ট হোস্টেলে থাকিয়া বি-এ পড়িত। বোধহয় বি-এ পড়িবার সময় তাহার অধঃপতন আরম্ভ হয়। সে কলেজের বাহিরে এমন জনকয়েক বন্ধুবান্ধবী যোগাড় করিয়া লয়—যাহাদের সচ্চরিত্রতার কোন বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট ছিল না। নানা ছলেছুতায় সে উহাদের সহিত মিশিয়া গোপনে আমোদপ্রমোদ করিত, সময়মতো হোস্টেলে ফিরিত না। মাঝে মাঝে তাহার পিতার নাম করিয়া অথবা জাল চিঠি লইয়া অপরিচিত

যুবক বা যুবতীরা তাহাকে হোস্টেলের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য লেডি-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিত। অথচ এই সকল অনভিপ্রেত মেয়েপুরুষের সহিত মেলামেশা করা তাহার পিতামাতা পছন্দ করিতেন না।

১৯৩৮ সালে বি-এ পরীক্ষার দিবার ঠিক পূর্বে অথবা কিছু পরে সুজাতা গর্ভবতী হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দিবার পর ৩রা মে তারিখে সে ধুবড়ি যায় ও ১৮ই জুলাই কলিকাতা ফিরিয়া আসে। এই সময় কলিকাতায় তাহাদের এক বাসা ভাড়া করা হইয়া ছিল। ঐখানে তাহার মাতা ও দুই ভাই থাকিত। সুজাতা তাহাদের নিজের বাসায় আসিয়া উঠে। সম্ভবত গর্ভসঞ্চার ব্যাপারটা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপ্রদ ও পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। সে ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে দায়ী তাহার সুসময়ের বন্ধুবান্ধবীদের সাহায্যভিক্ষা করে। সম্ভবত তাহারা সরাসরি তাহাকে কিছু সাহায্যদান করিতে ইচ্ছা করে নাই, অনেকেই হয়তো তাহার অসময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

এই অবিমৃষ্যা তরুণী চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছে—এমন সময় তাহার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিলেন পার্ক সার্কাস্‌-নিবাসিনী মিঃ এ, পি, ঘোষের পত্নী শ্রীযুক্তা উষানলিনী ঘোষ। ইনি সুজাতার প্রেমিকদের সহিত পরিচিত ছিলেন কিনা এবং তাহাদের কাহারো দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। যে ভাবে হোক্‌, বয়সের পার্থক্য সত্বেও তাঁহার সহিত সুজাতার ভাব হয় এবং নিজের বিপন্নাবস্থা দেখিয়া সে গোপনে তাঁহার সাহায্য-ভিক্ষা করে। উষানলিনী সম্ভবত লজ্জার হাত হইতে ও নির্বুদ্ধিতার পরিণাম হইতে সুজাতাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে গর্ভ নষ্ট করিতে উপদেশ দেন এবং এ সম্বন্ধে তাহাকে সহায়তা করিতে

প্রতিশ্রুত হন্‌। কিন্তু কুমারীর গর্ভ নষ্ট করা, গর্ভ নষ্ট করিতে ষড়যন্ত্র বা সাহায্য করা—এদেশের সামাজিক নীতির দিক্‌ দিয়া তো বটেই, আইনের দিক্‌ দিয়াও ঘোর অপরাধ।

যাহা হউক, ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে দুপুরে উষানলিনী সুজাতাদের বাসায় আসিয়া তাঁহার জন্মতিথির প্রীতিভোজে যোগদানের নিমিত্ত তাহার মাতার নিকট অনুমতি লইয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া যান্‌। জন্মতিথি ও প্রীতিভোজের কথা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুজাতাকে লইয়া কোথায় ঘোরাঘুরি করিয়াছিলেন বা কোথায় ছিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর তিনি মেয়েটিকে বালিগঞ্জের ডাঃ চাটার্জির ক্লিনিকে লইয়া আসেন। তারপর সত্য-সত্য কি ঘটিয়াছিল না ঘটিয়াছিল তাহা নিখুঁতভাবে জানার উপায় নাই। তবে এইটুকু জানা গিয়াছিল যে, কিছুক্ষণ পরে ডাঃ চাটার্জির অপারেশন্‌ টেবিলের উপর হতভাগিনী সুজাতার মৃত্যু হয়। ইতোমধ্যে উষানলিনীর স্বামী মিঃ এ, পি, ঘোষকে ও সুজাতার আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়া ক্লিনিকে আনানো হইয়াছিল।

এইরূপ দুর্ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। গভীর নিশীথে ডাক্তারের ক্লিনিক উদ্বেগচাঞ্চল্য, ভয়কাতরতা, ঘর্মাশ্রুবর্ষণ, সংজ্ঞাহীনতা, বিস্ময়বিমূঢ়তা ও সংগোপনতার প্রয়াসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখনি তখনি পুলিসে খবর না দিয়া ডাঃ চ্যাটার্জি একজন পরিচিত আইনজীবীকে সেখানে ডাকিয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তারপর উঁহার পরামর্শ-ক্রমে রাত্রি দেড়টা-দুইটার সময় থানায় সংবাদ দেওয়া হয়।

পুলিস আসিয়া লাস অপসারিত করে এবং ডাঃ চ্যাটার্জি, তাঁহার সহকারী ডাঃ মুখার্জি, ইঁহাদের সহিত মণিবাবু নামক এক ব্যক্তিকে

এবং উষানলিনীকে গ্রেপ্তার করে। ইঁহাদিগকে আলিপুরের দায়রায় সোপর্দ করা হয়। বিচারকালে উষানলিনী বলেন যে, সুজাতার গর্ভপাতে তিনি কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। ঘটনার দিন বেলা পাঁচটা হইতে সুজাতা তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে লইয়া তিনি সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সে অসুস্থ বোধ করায় তিনি তাহাকে ঢাকুরিয়া লেকে হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যান্। সন্ধ্যার অন্ধকারে বেড়াইতে বেড়াইতে সুজাতা এক জায়গায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহাতে সে পেটে ভীষণ আঘাত পায়। তারপর উষানলিনী তাহাকে প্রায় হিমাঙ্গ অবস্থায় ডাঃ চাটার্জির ক্লিনিকে লইয়া যান্। ডাঃ চাটার্জির ওখানে গিয়া সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। ডাক্তারবাবু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ইঞ্জেকশন্ দেন্, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বহাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এত চেষ্টা সত্বেও সে মারা যায়। তাঁহার অজ্ঞাতে অন্য কোথাও সে গর্ভপাত করাইয়া থাকিবে।

ময়না তদন্তে জানা যায় যে, সুজাতার যোনিদেশ হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হইয়াছিল; তাহার জরায়ুতে কোন সরু বস্তু দিয়া একাধিক বার স্পষ্ট খোঁচা দেওয়ার ও গর্ভপাত করাইবার চিহ্নসমূহ বর্তমান ছিল। ইহার পর আরো দুইজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত দেন। কিন্তু কিরূপ ধরণের যন্ত্র বা সরু বস্তু দিয়া খোঁচাইয়া ভ্রূণটিকে স্থানচ্যুত ও জরায়ুকে সচ্ছিদ্র করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দায়রার বিচারে ডাঃ চাটার্জি ও মুখার্জির দীর্ঘ কারাদণ্ডের ও উষানলিনীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মণিবাবু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান্। হাইকোর্টে আপীল করা হইলে, ডাক্তার দুইজন মুক্তি পান্, কিন্তু উষানলিনীর কারাদণ্ড বাহাল থাকে।

সুজাতার মৃত্যু শোচনীয়; তাহার জন্য হৃদয়হীন নীতিবাদীরও একটু-না-একটু দুঃখ হইবে। তাহার এই মর্মান্তিক পরিণামের জন্য সে একা দায়ী ছিল না। কতকটা দায়ী ছিলেন তাহার সন্দেহলেশ-শূন্য উদারস্বভাব পিতামাতা, আর খুব বেশী রকমের দায়ী ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালস্থিত ভদ্রবংশীয় কুট্টনী ও লম্পটের দল। শুনা যায়, পুলিস সুজাতার কয়েকজন গুপ্ত প্রেমিক ও সহকর্মিনীর সন্ধান ও গন্ধ পাইয়াছিল; তাহারা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও অর্থশালী পরিবারের সন্তান। তাহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ যথেষ্ট না থাকার জন্যই হোক্, প্রভাবশালী বড় ঘরের কেলেঙ্কারি প্রকাশে দ্বিধাবোধ করার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণেই হোক্, ওই সকল দুর্বৃত্তের একটিকেও কাঠগড়ায় হাজির করা হয় নাই। করিলে বোধ হয় সমাজের ও দেশের অনেকখানি উপকার হইত। কুমারীকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার কৌমার্য অপহরণ করা ও তাহার গর্ভোৎপাদন করার উপযুক্ত শাস্তি উহাদিগকে প্রদান করিলে দেশের লোক খুশি ও খানিকটা নিশ্চিন্ত হইত; এই জাতীয় ভদ্রবেশী অন্যান্য বদমায়েসরা অনেকখানি সতর্ক হইত। ইহারা সুজাতার মতো অনেক তরলমতি সরলবিশ্বাসী তরুণীর সর্বনাশ করিয়াছিল, এইভাবে আস্কারা পাইয়া আরো হয়তো করিতেছে ও করিবে!

চতুর্থ আলোচনা

পিতামাতার দায়িত্ব

বালকবালিকাদের শিক্ষাদান ও মানুষ করার ব্যাপারে পিতামাতার আদিম ও প্রধান দায়িত্বকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। যে পরিবারে পিতামাতা নিজেরা সচ্চরিত্র ও সর্বদা কন্যার উপর কড়া নজর রাখেন, সেখানে খুব কম কন্যাই খারাপ হইতে পারে। যেখানে পিতামাতা দুইজনেই অসৎ চরিত্রের, সেখানে পুত্র ভালো হইলেও হইতে পারে কিন্তু কন্যা কদাচিৎ ভালো হইতে পারে। আবার, যেখানে পিতামাতার যে-কোন একজন দুশ্চরিত্র—বিশেষভাবে মাতা, সেখানে পুত্র অপেক্ষা কন্যার স্বভাব খারাপ হইবার অধিক সম্ভাবনা। পারিবারিক প্রভাব ছেলের চেয়ে মেয়ের উপর বেশী ক্রিয়াশীল হয়।

পিতামাতার প্রভাবের অভাব

তদুপরি, যে সকল মেয়ে বাল্যকাল হইতে পিতামাতার প্রভাব, সঙ্গ ও সাহচর্য যৎসামান্য পায় বা মোটেই পায় না—ঝি, চাকর, বাবুর্চি, খানসামা, ড্রাইভার, সরকার মশাই, গৃহশিক্ষক, গৃহপালিত কুকুর, পাখি ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়া, প্রতিবেশিনী, বিদ্যালয়-সঙ্গিনীদের লইয়া যাহাদের জীবন কাটে, পিতামাতার কোন সদ্‌গুণেরই মূল্যাবধারণ ও অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বলবতী হইতে পারে না। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের যত্ন ও তত্ত্ব লয়, তাহাদিগকে আদর করে, শিক্ষা (কু বা সু) দেয়, তাহাদিগকেই তাহারা আপন বলিয়া ভাবিতে শিখে। রুচিবিকার ও পিতামাতার

প্রতি সংবৃত বিদ্রোহ ইহাদিগের মধ্যেই ঘটে বেশী। বংশ ও পরিবারের সুনাম ধ্বংসের গোপন এষণা ইহাদের মধ্যেই জাগে অধিক।

কোন কোন অভিজাত ও বিত্তবান পরিবারে 'খুকুবাবা', 'মিশি-বাবা' কিংবা 'দিদিমণি' জন্মের পর হইতে বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত ঝিচাকরের তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়। তাহাদের কোলে বেড়ায়, তাহাদের হাতে খায় ও পান করে, তাহাদের কাছে শোয়, তাহাদের সহিত গল্প করে, রোগশয্যায় তাহাদের নিকট দিবারাত্র সেবাশুশ্রূষা পায়, তাহাদের নিকট হইতে কাম ও দাম্পত্য আচার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের অতিরঞ্জিত ও বিকৃত উত্তর সংগ্রহ করে। দিনের মধ্যে মাতার সান্নিধ্য ইহারা ভোগ করে বড় জোর দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট। মায়ের কোল, চুম্বন ও সোহাগবচন ইহাদের নিকট চূড়ামণি-যোগের ন্যায় দৈবাদাগত ও স্বাতিনক্ষত্রের বারির ন্যায় দুর্লভ। পিতার দর্শন, নৈকট্য ও আদরও মরুভূমিতে বৃষ্টির ন্যায় ক্বচিৎ পাওয়া যায়।

পিতামাতা ও পুত্রকন্যা বহু বড়লোকের সংসারে পরস্পরের নিকট অনেকখানি অপরিচিত ও অজ্ঞাত রহিয়া যায়। তাঁহাদের প্রতি পুত্রকন্যার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অনেকখানি ভাসাভাসা—না-দেখাইলে-নয় গোছের। তাঁহাদের মেয়ে বলিয়া সমাজে নিজেকে পরিচিত করিতে হয়, তাঁহাদের উৎসমুখ হইতে অর্থ ও নিশ্চিন্ত আরামপ্রাচুর্য নামিয়া আসে বলিয়াই তাঁহাদিগকে না মানিয়া উপায় নাই। ইহাদের উৎকট পিতৃমাতৃভক্তির পর্দা সরাইলে—নিদারুণ অভিমান, বিরাগ ও ঘৃণার পুঞ্জীভূত ক্লেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

সচ্ছল ঘরে দাসদাসীর প্রভাব

কোন কোন পরিবারে দেখিয়াছি, মেয়ে কোন কিছুর জন্য অভিমান করিয়া আহার বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছে, বাপ-মা-ঠাকুরমা

আসিয়া তাহাকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া খাওয়াইতে পারেন না। শেষে বাড়ির এক পুরাতন ঝি বা চাকর অথবা এক দূর সম্পর্কীয় দাদা বা পিসির ডাক পড়িল; সে আসিয়া একটু গায়ে হাত বুলাইয়া দুটো মিষ্ট কথায় অনুরোধ করিবামাত্র খুকি অমনি বিছানা ছাড়িয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। পিতামাতা হাসিতে হাসিতে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—দেখেচ, খুকি অমুকের কিরকম বাধ্য। আমরা এত সাধলুম—শুনলে না, অমুক এসে ডাকবামাত্র কেমন সুড়্‌সুড়্‌ কোরে উঠে এল!....অশনবসন যোগাইয়াও কন্যার উপর তাঁহাদের প্রভাব যে কত অল্প তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন না, ব্যাপারটাকে খুব লঘু করিয়াই দেখিলেন।...এই সব মেয়ে যদি একদিন অমুক ঝি বা অমুক চাকরের ফুসলানিতে সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে বসেন—ছিঃ ছিঃ, আমাদের মেয়ে হোয়ে কি জঘন্য প্রবৃত্তি হ'ল ওর! শেষটা কিনা একটা চাকরের সঙ্গে—? এ যে স্বপ্নেরও অতীত। এখানে কি অভাবটা ছিল ওর?....একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, ওর সব চেয়ে বড় অভাব ছিল ওঁদের বুকভরা মমতার—ওঁদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের!

অনেক গৃহস্থ-বাড়ির উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়গামিনী মেয়েরা ভৃত্যদের সহিত স্কুলে যায় ও স্কুল হইতে আসে; ভৃত্য রাস্তায় তাহাদের রক্ষক ও পুস্তকবাহকের কাজ করে। স্কুল অত্যন্ত নিকটে থাকিলে ও ঘরের গাড়ি না থাকিলে, কোথাও অবস্থাপন্ন পরিবারের কন্যারা দারোয়ানের সঙ্গেও স্কুলে যাতায়াত করে। হিন্দুস্থানী দারোয়ানের ও ভৃত্যদের শালীনতা ও সংযমশীলতা গড়্‌পড়তা বাঙালী ভৃত্য অপেক্ষা অধিক। কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি, চন্দননগর, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বড় বড় শহরের রাস্তায় বেলা

দশটা ও চারিটার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, কোন কোন বাঙালি যুবক বা প্রৌঢ় ভৃত্য বর্ষীয়সী কন্যাদের প্রায় পাশাপাশি বা পশ্চাদ্বর্তী থাকিয়া, পুস্তক হস্তে লইয়া তাহাদের সহিত মশ্‌গুল্‌ হইয়া গল্প করিতে করিতে যাইতেছে; হয়তো উভয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতেছে। বাড়িতে মা-বাপ-আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে যেটুকু স্বাধীনতা লওয়া চলে না, সেটুকু তাহারা পথেঘাটে পারস্পরিক মূক সম্মতিতে লইবার চেষ্টা করে। ট্রামে-বাসে করিয়া মেয়েদের বাবা, কাকা, জ্যেঠা, দাদারা দশটার সময় যখন ভিড়ের চাপে পিষ্ট হইতে হইতে অথবা ঘণ্টায় আট মাইল বেগে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আফিসে যান, তখন মেয়েদের এই নির্লজ্জ হাসিগল্প লক্ষ্য করিবার তাঁহাদের সময় থাকে না। যাঁহারা হঠাৎ লক্ষ্য করেন, তাঁহারা হয়তো মনে মনে বলেন, ছিঃ, মেয়েগুলো কি বেহায়া দেখেচো? চাকরদের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে চলেছে!....ইঁহাদের চক্ষে যদি কখনো নিজেদের মেয়ে-ভাইঝি-বোনেদের এইভাবে আলাপচারির দৃশ্য পড়িয়া যায়, তাহা হইলে মনে করেন, আমাদের মেয়েটিও তেমন নয়, চাকরটাও তেমন নয়। সিধু একটু বাবুগোছের আর একটু লম্বা টেরি কাটে বটে, তাহলে ও বাজারের পয়সা চুরি করে না, বেশী ভাত খায় না, আর বক্‌লে টক্‌লে মাথা নীচু কোরে চুপ্‌চাপ্‌ থাকে। মাঝে মাঝে রামায়ণ পড়ে ও [জানেন না যে, ওর প্যাঁটরার মধ্যে বটতলার থিএটার ও রেকর্ড্‌-সঙ্গীত, রাজকন্যার গুপ্তকথা, সচিত্র রতি-শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থও লুকানো আছে!]। সম্ভবত রামায়ণের গল্প বলাবলি কর্তে কর্তে যাচ্ছে ওরা! [সীতাহরণের কথা মনেই পড়ে না ওঁদের!]

দাসদাসী-পাচক-ড্রাইভারদের অপকীর্তির কিছু পরিচয় প্রথম পর্বে আপনাদিগকে দিয়াছি; ও সম্বন্ধে আপনাদিগকে অন্তত আরো পঞ্চাশটা দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম আমি। কিন্তু একটা দিক্‌ লইয়া বহু

পৃষ্ঠা নিয়োজিত করা চলিবে না, লিখিবার ও আলোচনা করিবার বহু বিষয় এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে।....

পিতামাতাদের অপরাধের স্বরূপ ও মাত্রা

আমাদের প্রধান বক্তব্য হইল যে, মাবাপ যদি একটু কড়া ও চক্ষুষ্মান্ না হন, তাহা হইলে মেয়ের বিগড়াইয়া যাইবার অনেকখানি সম্ভাবনা থাকে। মাবাপের অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য ও নিরুদ্বেগ আত্মপ্রসাদের ফলে যে কত মেয়ের ইহকাল-পরকাল নষ্ট হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি, আরো দুই-একটি এই অধ্যায়ে দিতে চাই। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতা ইচ্ছা করিয়াই দুহিতাদের মাথা খান দেখিয়াছি। প্রতিনিয়ত হাল-ফ্যাসানের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান, প্রসাধনদ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহার, যখন-তখন প্রতিবেশী ও সঙ্গিনীদের বাড়িতে যাওয়া, যাহার-তাহার সহিত যেখানে-সেখানে বেড়াইতে বাহির হওয়া, অপরিচিতদের সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনা করা ও অনাত্মীয় অতিথিদের পাণ-চা-জলখাবার দিয়া অভ্যর্থনা বা সেবা করা; পাড়ার পাঠাগার হইতে খুশিমতো বাজে বই আনিয়া পড়া, রাত্রি করিয়া বাড়ি ফেরা, সহাধ্যায়িনীদের গৃহে উৎসবের অছিলা করিয়া রাত্রিযাপন করা বা দুইচারিদিনের জন্য তাহাদের সহিত ভ্রমণে বাহির হওয়া...প্রভৃতির সুযোগসুবিধা কিশোরী ও যুবতী কন্যারা পায় না—যদি পিতামাতা গোড়া হইতে শাসননিষ্ঠ হন্।

পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের আড়ম্বর

পনেরো-ষোলো-সতেরো বৎসর বয়স্কা মেয়েদের আঁটোসাঁটো ফ্রক ও স্কার্ট্ পরাইয়া শুধু বাড়িতে ঘোরোনো নহে, বিদ্যালয়ে, নিমন্ত্রণ-গৃহে ও রাস্তাঘাটে পাঠানোর রেওয়াজ শহরের অনেক

শিক্ষিত আধুনিক ভাবাপন্নের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে দুই-এক কথা প্রথম পর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি পরিচ্ছদ-রাজ্যে আর এক নূতন আপদ আসিয়া জুটিয়াছে। কিশোরী ও উদ্গতস্তনা কন্যাদিগকে পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো পোষাক পরাইবার রীতি কোন কোন তথাকথিত সভ্য ও অর্ধসভ্য নাগরিকদের পরিবারে অনুসৃত হইতেছে। দুই কাঁধের উপর দিয়া একখানা তিন ইঞ্চি টাক্ চওড়া ভাঁজ-করা চাদর বক্ষে যেভাবে বিন্যস্ত থাকে, তাহাতে সেখানকার অর্ধপ্রচ্ছন্ন উচ্চাবচতার প্রতি দর্শক-সাধারণের স্বতঃই দৃষ্টি আপতিত হয়।

এই পরিচ্ছদের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার বাজারেও সপ্তাহে তিনদিন মাছ ও সকালে জলখাবারের খরচ কমাইয়া পিতামাতাকে মেয়ের জন্য হাল-ফ্যাশনের সাড়ি ও ব্লাউজ কিনিয়া দিতে হয়, নহিলে সে অনশন-ধর্মঘট করে। রকমারি জুতা, রকমারি স্যাণ্ডাল—বৎসরে দুই-তিন জোড়া কিনিয়া দিতেই হইবে। কানের গহনা ও চুড়ির প্যাটার্ন ছয় মাস অন্তর বদ্লাইবার সঙ্গে পুরাতন ভাঙার সজল আবদার মাতাপিতার দরবারে নিয়মিত পেশ হয়। মেয়ে ডাল রাঁধিতে না পারুক—বিমোহন ছাঁদে বেণী বাঁধিতে পারে তো! অটুট নিটোল স্বাস্থ্য অর্জন করিতে না পারুক—পটু হস্তে অসৌন্দর্য ঢাকিতে পারে তো!....এদিকে কর্তা ও ছেলেদের ছেঁড়া জামায় হয়তো তালি চলে।

অজস্র সাবান, রুজ, পাউডার, ক্রীম, স্নো, লিপ্স্টিক্ কিউটেক্স, আইব্রাউ-পেন্সিল্ ও টিপ্ কিনিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পিতার যে অর্থব্যয় হয়, তদ্দ্বারা তিনি বাড়ির ছেলেদের জন্য দালদার পরিবর্তে মাসে দুই সের ঘি অথবা পনের সের দুধ কিনিতে পারিতেন। এই সকল প্রসাধন-দ্রব্যের প্রতি মেয়েদের আসক্তি এমনি বাড়িয়াছে যে, তাহারা সকালে-বিকালে স্নান করা ও গা ধোওয়ার সময় একপ্রস্থ সাবান তো ঘষিবেই,

তদুপরি বাকি জিনিসগুলির দ্বারা দেহসজ্জা না করিলে তাহারা যেন স্থস্থির হইতেই পারে না। স্কুল-কলেজে যাইবার পূর্বে তাহাদিগকে প্রায় আধঘণ্টাখানেক ধরিয়া প্রসাধন করিতে হয়—পাছে তাহাদের অকৃত্রিম রূপের খুঁৎ অন্য সতীর্থাদের, শিক্ষকশিক্ষিকাদের ও পথচারী নিমিষের দর্শকদের চক্ষে ভালো না লাগে এবং যাহাতে তাহার কৃত্রিম বেশভূষার ঝলক্ একজন-না একজনের মুগ্ধ স্তুতিকারের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিতে পারে।

রুজ, পাউডার, লিপ্‌স্টিকে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কী ক্ষতি করিতেছে তাহা বলিবার নয়। ছুলি, মেচেতা, ব্রণ, শ্বেতি প্রভৃতি চর্মরোগ কুমারী ও বিবাহিতা যুবতীদের মধ্যে প্রধানত এই কারণে ভয়াবহভাবে বিসর্পিত হইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানবান কবিরাজ মহাশয় সেদিন বলিলেন, মেয়েদের ওষ্ঠে বিশেষভাবে নিম্নোষ্ঠে ও কপালে টিপ্ দেওয়ার জায়গায় শ্বেতির দাগ হইতে দেখা যাইতেছে; কোন গৃহে বধূদের পায়ের পাতার পার্শ্বদেশে যেখানে আল্‌তা পরা হয়—সেখানে ধবল হইতেছে দেখি। তাহাতে মনে হয়, ওষ্ঠের লিপ্‌স্টিক্ বা শিশির আল্‌তায় এমন কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে যাহাতে এই সকল দুঃসাধ্য ব্যাধি জন্মিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যাহারা সর্বদা সাবান ও পাউডার মাখে, তাহাদের চর্ম কিছুদিন পরে লালিমাশূন্য অমসৃণ বিবর্ণ হইয়া যায়, মুখখানা যেন ডেয়ো-পিঁপড়ে-ভক্ষিত রসগোল্লার মতো শুষ্ক ও সচ্ছিদ্র বলিয়া মনে হয়।...

প্রসাধন-সামগ্রীর অতিরিক্ত ব্যবহার অর্থ ও স্বাস্থ্যনাশক জানিয়াও কয়জন পিতামাতা তাঁহাদের কন্যাদিগকে ওই পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন? কে ভাবিয়া দেখেন—যাহারা কৃত্রিম সাজসজ্জায় কিশোর হইতে অভ্যস্ত হয়, তাহারা কৃত্রিম স্বরে ও

আলাপ-ব্যবহারে লোককে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিবার কৌশল সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। দেহের ত্রুটি ঢাকিতে যাহারা পারদর্শী হয়, মনের বিচ্যুতি চাপিয়া রাখিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের আপনা-আপনি জন্মিতে পারে ও জন্মায়।

পর-ঘরীদের বেইমানি

গৃহশিক্ষকদের কথা আপনাদিগকে আগেই একটু বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি; এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। গৃহান্নপুষ্ট শিক্ষক ব্যতীত বড়লোকের বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে, স্বগ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের, স্বজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয়, একাধিক স্কুল-কলেজের ছাত্র, মুহুরি, গোমস্তা বা অল্পবেতনভুক্ কর্মচারিগণ আহার ও বাসস্থান পায়। কন্যাদূষণ ও বধূহরণ ব্যাপারে ইহাদের কার্যকারিতা নিতান্ত নগণ্য নহে। এরূপ দুটি-চারিটি দৃষ্টান্ত আপনারা নিশ্চয়ই নিজেরা অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া আমি আর পুস্তক ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদিগকে আমি বলিতে চাহি যে, যে গৃহে পরিসর অল্প ও স্ফুটনোন্মুখ কন্যা বা প্রোষিতভর্তৃকা বধূ থাকে, সেখানে অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গৃহে স্থানে না দেওয়াই উচিত।

যাঁহার প্রচুর অর্থ ও অন্ন আছে, তিনি দশজন বিশজনকে নিত্য খাইতে দিন্—আপত্তি নাই, কিন্তু নিজ গৃহে কাহাকেও যেন আশ্রয় না দেন। কখন্ কোন্ ফাঁক্ দিয়া তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরে পাপরূপী কালসাপ আসিয়া ঢুকিবে—তাহা তিনি জানিতেও পারিবেন না। চরম বিপদ যখন ঘটিয়া যায়, তখন তাঁহারা স্বামিস্ত্রীতে একান্তে বসিয়া বিস্ফারিতচক্ষে বলাবলি করিতে থাকেন—দেখেচ লোকটার আক্কেল! খেতে পেত না, আমি বাড়িতে আশ্রয় দিলুম, কলেজে

হাফ-ফ্রী কোরে দিলুম, এতকাল খাওয়ালুম পরালুম, শেষটা কিনা আমারই সর্বনাশ কর্ল? হতভাগা বেইমান্ কোথাকার?...এই সকল স্বজনবৎসল বোম্‌ভোলা ব্যক্তি এমনিভাবে তাঁহাদের হিতচিকীর্ষার অনেক সময় প্রতিদান পান এবং ঠেকিয়া ও ঠকিয়া পরিণামে সতর্ক হন্। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—পর-ভাতী হওয়া ভালো, পর-ঘরী হওয়া ভালো নয়। আমি একটা নূতন প্রবচন রচনা করিতে চাই—পরকে ভাতী করা ভালো, পরকে ঘরী করা ভালো নয়।...

ব্যায়াম-শিক্ষকের বিশ্বাসঘাতকতা

পিতামাতার দোষে অথবা নির্দোষ প্ররোচনায় মেয়েরা পাপের পথে নামিয়া আসে, তাহার দুটি-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দুইটি আমার কোন ভক্ত পাঠক মফস্বলের কোন ক্ষুদ্র শহর হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ সংবাদদাতাকে আমি বহুদিন ধরিয়া ভালোভাবে জানি ও তাঁহার সততায় পরিপূর্ণ আস্থা রাখি। আমার রীতি অনুযায়ী ঘটনোক্ত নায়কনায়িকাদের সত্যকার নামধাম গোপন করিতেছি।...

"এখানে একটি আশ্রম আছে। রামকৃষ্ণ মিশনের অনুকরণে ইহা গঠিত। ব্যোমকেশ ব্রহ্মচারী ইহার অধ্যক্ষ। আশ্রমসংলগ্ন বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া লাঠিখেলা, কুস্তি ও নানারূপ শারীরিক ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা আছে এবং স্থানীয় অনেক ছেলে এই সকল শারীরচর্যাপদ্ধতি উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে সযত্নে শিক্ষা করিয়া থাকে। ব্যোমকেশ সন্ন্যাসী স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করেন। স্থানীয় লোকেদের সাহায্য ও সহানুভূতির দ্বারা এই আশ্রমটি চলে।

"আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-তিথি উপলক্ষে এখানে কিছুদিন পূর্বে যে বিরাট

উৎসবের আয়োজন হয়, তাহাতে — কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর ক্ষীরোদবাবুকে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করার জন্য মঠাধ্যক্ষ আমন্ত্রণ করেন। তদনুযায়ী সশিষ্য ক্ষীরোদবাবু যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হইয়া, নির্দিষ্ট দিনে মঠের ক্রীড়াভূমিতে তাঁহার অপূর্ব ব্যায়ামকৌশল দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। ক্ষীরোদ-বাবুর শিষ্যটিও ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। ব্যায়ামবীরদ্বয়ের যশ খুব ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রত্যহই তাঁহাদিগকে দেখার জন্য আশ্রমে খুব ভিড় হইতে লাগিল; বিশেষ করিয়া মেয়েদের ভিড় খুব বেশী হইল। মঠাধ্যক্ষ প্রমাদ গণিলেন। কথা ছিল অনুষ্ঠানের পর ক্ষীরোদবাবু চলিয়া যাইবেন। কিন্তু চলিয়া যাওয়া দূরের কথা, তিনি প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, যা দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে লাঠি ও ছোরা খেলা মেয়েদের শিক্ষা করা আশু প্রয়োজন। ব্রহ্মচারী দেখিলেন কথাটা খুবই সত্য। তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

ব্যায়াম করার জন্য অনেক মেয়ে তাঁহার আশ্রমে নিত্য ভিড় করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের কিছু কিছু শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। মেয়েদের ব্যায়ামশিক্ষা দিতে যাইয়া ক্ষীরোদবাবুর যশ-সুনাম সব নষ্ট হইতে বসিল। আশ্রম-সংলগ্ন একটি পরিবারের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি অবসর পাইলে যখন-তখন ঐ গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

"গৃহস্বামী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এখানে জেলা বোর্ডে মাত্র — টাকা মাহিনায় কাজ করেন। অথচ পরিবারে ৭টি মেয়ে, ২টি ছেলে, স্বামী-স্ত্রী। প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন; দ্বিতীয় কন্যা করুণা বি.এ. পাস, তৃতীয়টি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। তৎপরের দুইটি স্কুলে পড়ে। ছেলে দুইটি বড়, একটি চাকুরি করে। আমাদের ঘটনা করুণাকে লইয়া।....ক্রমে মেয়েদের লাঠি খেলা ছোরা খেলা উঠিয়া গেল। কারণ

ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, মেয়েরা অক্ষম, এ সব বীরপুরুষোচিত বিদ্যা কস্মিন্‌কালেও তাহারা শিখিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে করুণাকে লইয়া তিনি মশ্‌গুল্ হইয়া পড়িয়াছেন। সকালে বৈকালে ক্ষীরোদবাবুর জলযোগ এবং চা-পান করুণাদের বাসায় সম্পন্ন হইত। ক্ষীরোদবাবুর আসিতে বিলম্ব হইলে শ্রীমতী নিজে জলখাবার সাজাইয়া আশ্রমে লইয়া যাইত। এসব কাজে সাহায্য করিতেন তাহার মা স্বয়ং।

"বৈকালে চা-পানের পর শ্রীমতী তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত। ইতিমধ্যে কলেজ হইতে ক্ষীরোদবাবুকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসা সত্ত্বেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তাঁহার শিষ্যকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে করুণাদেবীকে লইয়া পুরাপুরিভাবে মাতিয়া উঠিলেন। ইহাতে নানাপ্রকার কুৎসা রটিল। কিন্তু গৃহকর্ত্তা দেখিয়াও দেখিলেন না। কারণ মেয়ে বয়স্থা, শিক্ষিতা—সর্ব্বোপরি তাহার বিবাহ দিতে তিনি বর্ত্তমান বাজারে অপারগ। ধীরেনবাবুর এক ছোট ভাই করুণাকে সতর্ক করিয়া দিতে গেলে করুণা বলিল, আমার ভালমন্দ আমি ভালো বুঝি। আমার ঘরে আমি যা খুশী করিব। তাহাতে কাহারো intefrere করার দরকার দেখি না।

"যথারীতি ক্ষীরোদবাবুকে প্রতিসন্ধ্যায় করুণার ঘরে উপবিষ্ট দেখা যাইত। তাহার হাতে চা-পান না করিলে ক্ষীরোদবাবুর সমস্তই তিক্ত মনে হয়; সে মাথা টিপিয়া না দিলে ক্ষীরোদবাবুর মাথা-ধরা সারে না; তাহার চুম্বন না পাইলে অশান্ত ক্ষীরোদসমুদ্র ক্ষোভে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সময় সময় ইহাদের মধ্যে মান-অভিমানের পালা চলিত। আমাদের বউদি সম্পর্কিতা তটিনী নাম্নী একটি বিবাহিতা মহিলাকে উহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিলাম। সে উহাদের প্রতিবেশিনী, সর্বদা উহাদের বাসায় যাতায়াত করিত।

"তটিনী এক সন্ধ্যায় করুণার খোঁজে তাহাদের বাসায় আসিল। করুণা এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, কারণ সে তখন ক্ষীরোদবাবুর প্রণয়প্রমত্ত ছিল। তটিনী তাহার ঘরের কোণে যাইয়া উঁকি দিয়া দেখিল, শ্রীমতীকে বক্ষে লইয়া ক্ষীরোদবাবু পরম প্রশান্তিতে শুইয়া আছেন ও তাহার জঘনোপরি হস্ত বুলাইতেছেন। তটিনী চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল কেহ আসে কিনা। সে অতি সন্তর্পণে গৃহকোণের বাহিরে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথা শুনিতে পাইল।

ক্ষীরোদবাবু।—দেখ করুণা, তুমি আসল জায়গায় ধরা দিতেছ না। আমি কতদিন আর অপেক্ষা করিব?

করুণা।—আমি কি বলিব? শেষে যদি কোন কিছু হইয়া পড়ে তখন কি হইবে?

ক্ষীরোদবাবু।—কিছু না হওয়ার ব্যবস্থা আমার জানা আছে। আর তা ছাড়া তোমার মায়ের অনুমতি লইয়া তোমাকে তো বিবাহই করিব। তবে তোমার ভয় কিসের?

করুণা। না, তাহা হইলে আর কিছুতে আমার ভয় নাই।

ক্ষীরোদবাবু।—এস, তবে আজই তোমাকে বিবাহিত জীবনের প্রথম রসাস্বাদন করাই।

করুণা।—তোমার যা ইচ্ছা কর। আমি আর 'না' করিব না।

"ইহার পর তটিনী ক্ষিপ্রপদে সেই স্থান ত্যাগ ধরিয়া আপন গৃহে চলিয়া আসে। পর দিবস তাহাদের বাসায় গেলে সে আমাকে উপরোক্ত ব্যাপারটি জানাইল।

"আমি ইহার পর মঠাধ্যক্ষের সহিত দেখা করি এবং ক্ষীরোদবাবুকে আশ্রম ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়া আসি। ব্রহ্মচারী পূর্বাপর সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছেন; তিনি বারবার ক্ষীরোদ-বাবুকে চলিয়া যাইতে বলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে, করুণাদের

গৃহে আসিয়া ক্ষীরোদবাবু বাসা বাঁধিলেন। করুণার মা বলিলেন, "বাবা, পাড়ার লোকে হিংসা করিয়া তোমার নামে যা-তা বলিতেছে; শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তুমি আমার বাসায় থাক। কিছুমাত্র লজ্জা করিয়ো না।"

"গোপন প্রেম আর বেশীদিন গোপন থাকিল না। পাড়ায় ঢি ঢি পড়িয়া গেল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী যাইয়া ধীরেনবাবুকে বলিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "ভাই, মেয়ের ত বিবাহ দিতে পারিব না; যদি একটা পাত্র এভাবে পাওয়া যায় ত মন্দ কি!" ইহার পর এ ব্যাপার লইয়া আর কেহ উচ্চবাচ্য করিল না।

"দুই মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। শ্রীমতীর গা-বমি বমি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্ষীরোদবাবুও সুযোগ বুঝিয়া একদিন চুপিসাড়ে চম্পট দিলেন। করুণা চারিদিক অন্ধকার দেখিল, তাহার মাতা হায় হায় করিতে লাগিলেন। ক্ষীরোদবাবুকে কত চিঠি দিলেন—"বাবা, তোমাকে বড় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তুমি সত্বর চলিয়া আইস এবং আমার মেয়ের কলঙ্ক মুছিয়া দাও।" কিন্তু কোথায় ক্ষীরোদ?

"আরও দেড় মাস কাটিয়া গেল। মা দেখিলেন আর অপেক্ষা করা চলে না। পুরুষ জাতির তথা ক্ষীরোদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে কলিকাতা গেলেন। তথায় অনেক আত্মীয়স্বজন আছে, জানাজানি হইতে পারে ভাবিয়া মেয়েকে লইয়া সুদূর কাশী চলিয়া গেলেন। তথায় গর্ভপাত করাইয়া প্রায় তিন মাস পরে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর করুণা একদিন আমাদের বাসায় আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহার চেহারায় পূর্ব্বের জৌলুস আর নাই; চোখের নীচে কালিমা পড়িয়াছে। অন্তরে যেন এক গভীর ক্ষতের বেদনাকে চাপিয়া রাখিতে গিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।...

"সম্প্রতি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া ধীরেনবাবু সপরিবারে -পুরে আছেন। করুণা কলিকাতায় চাকুরির চেষ্টায় আছে।

"ক্ষীরোদবাবু সম্বন্ধে পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, লোকটি —এ দুইটি মেয়েকে মজাইয়াছে এবং কোন এক ক্ষেত্রে নাকি প্রহৃতও হইয়াছিল। তথাপি আশ্চর্য যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাকে ছাড়াইয়া দেন নাই।...তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, তাহার ক্রীড়ানৈপুণ্য অপূর্ব্ব!"

হাসি ও খুশির বিপদরাশি

১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে আর এক পরিবারের যুগ্ম ঘটনার বিবরণ পাই।...আর্থিক সাচ্ছল্যলাভের জন্য দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা সমর্থা মেয়েগুলিকে তথাকথিত ধনী যুবক ও সচ্ছল অবস্থার বিবাহিত ব্যক্তিদের হস্তে ছাড়িয়া দেন তাহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী কলুষ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য,—এরূপ ব্যাপার ইউরোপ আমেরিকায় যেমন লাখে লাখে ঘটে, এদেশেও তেমনি হাজারে হাজারে ঘটে জানিবেন। ভদ্রবংশে জন্মিয়া, ভদ্রপল্লীতে থাকিয়া, আবাল্য সৎশিক্ষা পাইয়া, পেটের জ্বালায় উপায়ান্তর না দেখিয়া, কন্যাদের দেহ খাটাইয়া উদরান্নের সংস্থান করে ইহারা। কিন্তু কতখানি কলঙ্ককালিমা মুখে মাখিয়া ও কতখানি বিপদের ঝুঁকি লইয়া ইহারা সাচ্ছল্য অর্জন করে —তাহার খোঁজ লইলে সমস্ত অন্তরাত্মা ঘৃণায় রি রি করিয়া উঠে। আলোচ্য গল্পটি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

আবার এমন পরিবারও আছে যেখানে মোটামুটি অন্নবস্ত্র থাকিলেও দুরাকাঙ্ক্ষ মাতা কিংবা পিতা অথবা উভয়েই হয় বিনা-পণে কন্যার জন্য একটি স্বামী যোগাড় করিয়া দিবার জন্য নতুবা সংসারে প্রাচুর্য আনিবার অভিলাষে কন্যাদিগকে কৈশোরপ্রারম্ভ হইতে সর্বপ্রকারে স্বাধীনতা দেন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ যখন স্বদেশীবিদেশী

যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণে ছাইয়া গিয়াছে, তখন সর্বজাতীয় সমরলিপ্ত ব্যক্তির উদগ্র কামলালসায় ইন্ধন যোগাইতে শুধু বারনারীরা ছুটিয়া আসে নাই, বহু কুমারী ও বধূ সর্বপ্রকার শালীনতা ও ইতিহ বিসর্জন দিয়া ছুটিয়াছিল—মুখ্যত অর্থ ও গৌণত নূতন প্রমোদোন্মাদনার লালসায়। ইহাতে বহুক্ষেত্রে অভিভাবকগণ, এমন কি স্বামী-শ্বশুর পর্যন্ত স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন সম্মতি বা প্রণোদনা প্রদান করিয়াছিলেন। সেদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের সনাতন সংযমনীতির জরাজীর্ণ বাঁধ একটি কামানের গোলায় ধূলায় মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে লজ্জাকর অধ্যায়ের আলোচনা করিবার স্থান এখানে হইবে না। ঐ সময় পূর্ব-বাংলার বেসামরিক পরিবেশে সংঘটিত ঘটনা দুইটির কাহিনী এইবার বিবৃত করি।

"— জেলার অন্তর্গত — শহরে শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ রায় (ছদ্মনাম) মোক্তারি করিতেন। রোজগার তাঁহার বিশেষ কিছুই ছিল না। উপার্জ্জন যাহা করিতেন তাহার দ্বারা ছয় কন্যা, এক পুত্র, নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোষণ চলিত না। বলা বাহুল্য, সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে সময় সময় অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইত। সুখেন্দু বাবুর বড় ছেলে এম. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় সদাগরী অফিসে চাকরি করে। সম্প্রতি যুদ্ধের কৃপায় তাহার যথেষ্ট পদোন্নতি ঘটিয়াছে।

"শ্রীযুত বীরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ছদ্মনাম) নামক এক মুন্সেফ্ এখানে বদলি হইয়া আসেন। বীরেশ বাবুর বয়স ৩২-৩৩ হইবে, অবিবাহিত। কিভাবে যেন কিছুদিনের মধ্যেই সুখেন্দু বাবুর পরিবারের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা ও ঘন ঘন দেখাসাক্ষাতের পালা সুরু হইল। সুখেন্দুবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাদ্বয়—হাসি ও খুশী বিবাহযোগ্যা। ক্রমে বীরেশ বাবু এই পরিবারে আর্থিক সাহায্য

করিতে লাগিলেন এবং বিশেষভাবে মেয়ে দুইটির সহিত ভাব করিয়া লইলেন। এই অর্থ সাহায্য বিষয়ে, হইতে পারে, কন্যাদ্বয়ের উপর পিতার গোপন ইঙ্গিত ছিল। কারণ সংসারের পুরাপুরি ব্যয়-নির্ব্বাহের তাঁহার অন্য কোন উপায় ছিল না।

"কয়েকদিন পরে প্রতি সন্ধ্যায় ভগ্নীযুগলের কণ্ঠসঙ্গীত শোনা গেল। বীরেশ বাবু তাহাদের জন্য হার্মোনিয়াম্ কিনিয়া দিয়াছেন। গান শিখাইবার জন্য একজন মাস্টার পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছে। মাসের শেষে সঙ্গীতশিক্ষক মহাশয় বীরেশ বাবুর নিকট হইতে তাঁহার পারিশ্রমিক লইতেছেন। সন্ধ্যার পর সুখেন্দুবাবুর বাসায় যাওয়া মুন্সেফ্ বাবুর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। ইহা লইয়া স্থানীয় লোক নানাপ্রকার কানাঘুষা করিতে লাগিল। বাপমায়ের এসবে কোন আপত্তি ছিল না; তাঁহারা হাকিম জামাইয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ক্রমশঃ বীরেশ বাবু ভগ্নীদিগকে তাঁহার নিজের বাসায় আনাইয়া চা পান ও পরিশেষে আহারাদি করাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে বাসায় পৌছাইয়া দিতেন। বাসায় এক উড়ে পাচক ও চাকর ভিন্ন আত্মীয় বা আত্মীয়া কেহ ছিলেন না।

সুখেন্দুবাবুর এক যুবক ভাগ্নে তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্থানীয় কোন ব্যাঙ্কে চাকুরি করিত। প্রতিবেশীদের দ্বারা সময় সময় জিজ্ঞাসিত হইয়া সে অম্লানবদনে মুন্সেফ্ বাবুর কার্য্যকলাপ তাহাদের নিকট বিবৃত করিত। কবে একদিন হাসি বীরেশবাবুর গলা ধরিয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়াছিল, তাহাও সে বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া ভাগ্নেটির মামার উপর একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল।

"এক বৎসরের মধ্যে হাকিম সাহেবের বদলির হুকুম আসিল। কিন্তু বড় বোন হাসি তখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী এবং বীরেশবাবু

এজন্য দায়ী। কেলেঙ্কারি যাহাতে বাহিরে প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য হাসির মাতা কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি হাকিমি মেজাজে উত্তর দিয়াছিলেন, "আচ্ছা, সে তো নিশ্চয়ই হবে। এতে আর কি?" মায়ের মন কতকটা আশ্বস্ত হইল। কিন্তু 'আচ্ছা' আচ্ছাই থাকিয়া গেল। বীরেশবাবু বদলি হইয়া নিশ্চিন্তে চলিয়া গেলেন।

"হাসি পাঁচ মাস অতিক্রম করিয়া ছয় মাসে পড়িল। এদিকে বীরেশের কোন খোঁজ নাই। কাজেই গর্ভপাত করা ভিন্ন আর উপায় কি? সুখেন্দুবাবুর এক বিধবা বোন তাঁহার বাসায় থাকিতেন। তিনি একাজে অগ্রণী হইয়া বিশেষ সাহায্য করিলেন। শহরের অনেকেই ইহা জানিল, এবং এই বাসার উপর পুলিশের কড়া নজর থাকিল যাহাতে গর্ভ নষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া হাসির পিসিমা তাঁহার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলেন এবং গভীর রাত্রে তাঁহার ছেলেটির সাহায্যে সুখেন্দুবাবুর বাসার নিকটবর্ত্তী খালের তীরে শিশুটির মৃতদেহ পুঁতাইয়া রাখিলেন। দুইদিন পরে শৃগাল কর্তৃক এই মৃতদেহ ভক্ষিত হইয়াছিল।

"আট মাস পরের কথা। খালের অপর তীরে একটি বাসা—ঠিক সুখেন্দু বাবুর বাসার মুখোমুখি। সদ্য পাস-করা ডাক্তার ধ্রুবেশচন্দ্র গুহ এই বাসায় থাকেন। ডাক্তারি পড়িবার কালে টাউনে তিনটি কুমারীর ইজ্জৎ হরণ করিয়া ও তাহাদের একজনের গর্ভোৎপাদন করিয়া ইনি কিছু নাম কিনিয়াছিলেন। সুখেন্দুবাবুর পরিবারে এ হেন মহাপুরুষের বিনাপয়সায় চিকিৎসার সুযোগ লইয়া সময়ে অসময়ে যখন-তখন তাহার যাতায়াত সুরু হইল। মুন্সেফবাবুর মত অত আদর যত্ন না পাইলেও হাসি ও খুশীর মন অতি সত্বরই

তিনি পাইলেন এবং ইহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। কারণে অকারণে যাওয়া আসা লইয়া সুখেন্দুবাবুর ভাগ্নেটির সঙ্গে সহিত ডাক্তারের মাঝে মাঝে বচসা হইতে লাগিল। তাহার মামীর নিকট তাহার বিরুদ্ধে ডাক্তার অভিযোগ করিলে মামীমা তাহাকে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে বলেন। কাজেই ভাগ্নে বাবাজী অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিল।

আমি ভাগ্নেটির নিকট পরে শুনিয়াছি, ধ্রুবেশ ডাক্তার সুখেন্দু বাবুর পরিবারে অনেক আর্থিক সাহায্য করিত এবং তাঁহার ছেলে ও দুইটি মেয়ের স্কুলের বেতন যোগাইত। অসতর্ক মেলামেশার ফলে হাসির পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইল। ডাক্তার সহর ছাড়িয়া কিছুকাল গা-ঢাকা দিয়া থাকিল। যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া গর্ভ নষ্ট করা হইল। এই সকল কেলেঙ্কারীর কথা লোকমুখে শুনিয়া সুখেন্দুবাবুর বড় ছেলে দেশে আসা একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিল। কোন প্রকারে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুখেন্দু বাবু অতি গোপনে হাসির বিবাহ —র মধ্যে কোন একস্থানে স্থির করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া ফেলেন। এইস্থলে বলিয়া রাখি—হাসি দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী। খুশীও সুন্দরী; কিন্তু রং অপেক্ষাকৃত কালো ছিল। সম্প্রতি হাসি একটি ছেলে ও একটি মেয়ে লইয়া ঘরসংসার করিতেছে।....

"আরও দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া খুশী অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে সে প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা একবার দিয়াছে, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ১৯৪৪ সালে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হইতে লাগিল।.... পড়ানোর জন্য একজন মাষ্টার রাখা হইয়াছে। মাষ্টারটি সুখেন্দুবাবুর খুড়তুতো ভায়ের শ্যালক, নাম শ্রীযুত মণিমোহন রায় চৌধুরি; দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স ত্রিশের কোঠায়। মণিবাবু ফৌজদারী আদালতে

চাকরি করেন। তিনি সুখেন্দুবাবুর বাসার সহিত সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র বাসায় উঠিয়া আসিলেন। সুখেন্দুবাবুর বাসায় আহারাদি চলিত এবং তাহার প্রতিদানে খুশীকে পড়াইতেন। খুশী কোনদিন সকালে কোনদিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাসায় যাইয়া পড়িত।

"ক্রমে ক্রমে মণিবাবুর মাথা ধরা, গাত্র ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিল। ছাত্রীটি নির্ব্বিবাদে তাঁহার শরীর টিপিয়া দিত। খুশীর ছোট বোনেরা কোন সময় তথায় উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইত দিদি পড়াশুনার পরিবর্ত্তে মাষ্টার মহাশয়ের মাথা কোলের মধ্যে রাখিয়া হাত বুলাইয়া দিতেছে। ইহাতে পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। খুশী বান্ধবীদের নিকট সময় সময় বলিত, "মাষ্টার মহাশয় আমাকে কলিকাতায় লইয়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিবেন এবং নিজের খরচে বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইবেন।"

"ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আসিল; খুশী পরীক্ষা দিল। ইতিমধ্যে এক তার পাইয়া মাষ্টার মহাশয় বদলি হইয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুখেন্দু বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রের পদোন্নতি হইয়াছে। সে কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়া সকলকে তথায় লইয়া গেল।

"যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল খুশী ফেল্ করিয়াছে। তারপর সে এ. আর. পি.তে চাকরি লইল। নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে সুবিমল নামে একটি যুবকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। উভয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইল। এ বিবাহে একটি পয়সা খরচ নাই, কাজেই কন্যার বাপমায়ের অমত করার হেতু নাই। দাদা প্রথমটা মৃদু আপত্তি করিয়া শেষটা সম্মতি দিতে বাধ্য হইল।

"বিবাহের পর স্ত্রীর আচরণ সুবিমলের নিকট কেমন যেন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল। মাত্র একমাস হইল বিবাহ হইয়াছে

অথচ খুশী যেন তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়। আর একটি বিষয় সে লক্ষ্য করিল—বউয়ের পেট বেশ কিছু বড় হইয়াছে। খুশীর নিকট বার বার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও সে কোন সদুত্তর পায় না। সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার দ্বারা সে স্ত্রীকে পরীক্ষা করাইল। ইহার ফলে তাহার সাত মাসের গর্ভ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুবিমলের স্নেহভালবাসা এক নিমেষে উবিয়া গেল; ঘৃণায় লজ্জায় ক্রোধে সে অধীর হইয়া উঠিল। একদিন সে ক্রন্দনরতা স্ত্রীকে একবস্ত্রে তাহার পিতার নিকট রাখিয়া গেল।

"যথা সময়ে খুশী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। বর্ত্তমানে শিশুটি অন্যের নিকট থাকিয়া লালিত পালিত হইতেছে। কলিকাতার এক কোর্টে সুবিমলের বিরুদ্ধে খুশীর ভরণপোষণের জন্য মাসোহারা দাবি করিয়া সুখেন্দুবাবু এক মামলা রুজু করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বর্ত্তমানে কোন এক নার্সেস্ কোয়ার্টার্সে থাকিয়া খুশী নার্সগিরি শিক্ষা করিতেছে। পুনরায় তাহার জীবনের আবর্ত্তন কোন্ দিকে যাইবে কে জানে?"...

রাজাদের প্রথম আস্বাদনের কদভ্যাস

ইংরাজ রাজত্বকালে ভারতের কোন কোন করদরাজ্যে নিয়ম ছিল যে, তাঁহার অধীন নিম্নোচ্চ কর্মচারিদের অথবা প্রজাদের কোন সুন্দরী কন্যা বিবাহের পূর্বে প্রথম ঋতুমতী হইলে এবং তাহা রাজার কর্ণগোচর হইলে, অভিভাবক রাজাদেশে তাহার কন্যাকে রাজার প্রমোদাগারে প্রথম আস্বাদনের জন্য পৌছাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। রাজা তাহাকে আপন খুশিমতো এক রাত্রি বা একাধিক রাত্রি উপভোগ করিয়া সামান্য কিছু উপহার ও আশীর্ব্বাদ সহ কন্যাটিকে ফেরৎ দিতেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন রাজার এমনি কদভ্যাস ছিল যে,

তিনি তাঁহার অমাত্য ও অন্য কর্মচারিদের কাহারো লাবণ্যবতী ভার্যা বা ভগ্নীকে যে-কোন রাত্রিতে উপভোগের জন্য ডাকিয়া পাঠাইতে পারিতেন। যেদিন কোন পাড়ায় সন্ধ্যার পর রাজবাড়ির তাঞ্জাম ও ফার্মান হস্তে একজন বরকন্দাজ ও একজন সিপাই আসিয়া প্রবেশ করিত, সে পাড়ায় সেদিন শঙ্কিত সোরগোল পড়িয়া যাইত; যে বাড়ির দরজার সামনে আসিয়া পাল্কি থামিত, সেখানকার স্ত্রীপুরুষ থরহরি কম্পমান হইয়া রাজা ও ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে থাকিত।

ভারতের বড় বড় জমিদার ও ইউরোপের রাজা, লর্ড, ডিউক্ ও কাউন্টদেরও অনেকের এই কদভ্যাস ছিল; উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে ইহাকে দুষ্পরিহার্য প্রথা বলিয়া মানিয়া লইতে চেষ্টা করিত। রাজা বা জমিদারের এই অভিলাষকে অপূরিত রাখিবার সাধ্য কাহারো ছিল না। রাজার কামাগ্নিতে ইন্ধন দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে কত কুমারী ও বধূ যে আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত অভিভাবক ও স্বামী যে রাজার হুকুম অমান্য করিয়া কর্মচ্যুত, উৎপীড়িত, নির্বাসিত বা কারাদণ্ড-প্রাপ্ত হইয়াছে—এমন কি আত্মহত্যা করিয়াছে ও ঘাতকের খড়্গতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার হিসাব রাখা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সুসাধ্য হয় নাই। ফিউডালিজম্-এর এই দুরত্যয় পাপাচার মধ্যযুগের কঠোর আচারনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যপালনের ফেনিল স্রোতের উপর দিয়া খরবেগে ভাসিয়া চলিয়াছিল; সম্প্রতি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রবল প্রভঞ্জন আসিয়া ইহাকে বানচাল করিয়া দিয়াছে।

অপরের পাপবাসনা চরিতার্থতার জন্য নিজের কন্যাভগ্নীবধূদান রাজার আইন—সমাজসম্মত দেশাচার রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ

রাজা ও ভূম্যাধিকারীকে দেবতার অবতার মনে করিয়া ভক্তি সহকারে এই আচার মানিত; কেহ রাজপুরুষের হস্তে ভয়াবহ উৎপীড়নের ভয়ে—কেহ বা প্রাণের ভয়ে এই আইনের ফাঁস ঘৃণাভরে গলায় পরিত। প্রজার উপায়ান্তর ছিল না, ইহার মধ্যে তাহার কোন কু-অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু যাহারা পদোন্নতির উদ্দেশ্যে—অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে—আশানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিজের স্ত্রীকন্যাভগ্নীদিগকে রাজা, রাজপুরুষ, ভূম্যধিকারী, বড় সাহেব বা বড়বাবুর পদে ডালি দিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে ও এখনো হয়, তাহাদিগকে আপনারা কি বলিবেন? ভারতে ও বাংলাদেশে বিংশশতাব্দীতেও অসংখ্য ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে; তবে ইহার সংখ্যা সম্প্রতি কিছু কমিয়া আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে এত ঘটনা আমাদের জানা আছে যে, সেগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া একখানা বিরাট গ্রন্থ লেখা যায়।....

এক যে ছিল হাকিম সাহেব

বৎসর ত্রিশ-চল্লিশ আগেকার কথা। কোন প্রদেশে একজন মহকুমা-হাকিমের চরিত্রদোষ ছিল। তিনি যখন যে মহকুমায় বদলি হইয়া যাইতেন, তখন সেখানকার চাপরাশি, পেস্কার ও আমলাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। চিররুগ্না স্ত্রী তাঁহার—তিনি প্রায়ই রাজধানীতে থাকিতেন। তাঁহার বাসায় মাঝে মাঝে এক বৃদ্ধা দিদি আসিয়া থাকিতেন; অন্যসময় একটি পাচক ও একটি ভৃত্যই তাঁহার গৃহের তত্ত্বাবধান করিত। আমলাদিগকে তিনি দুইহাতে ঘুষ আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দিতেন যদি তাহারা প্রতি শনিবার রাত্রিতে একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরীকে তাঁহার বাংলোয় আনিয়া উপহার দিত।

রূপোপজীবিনীতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু সর্বাপেক্ষা লোভ ছিল তাঁহার ভদ্রবংশীয়া বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতীর উপর। অরমিতা স্বাস্থ্যবতী ভদ্রবংশীয়া কুমারী হইলে তো কথাই নাই; তিনি আনয়নকারীকে কিছু পুরস্কৃতও করিতেন। বিধবাতে তাঁহার রুচি ছিল না। কোন কোন সময় আসামীদের সুন্দরী কন্যা-বধূ-ভগ্নীগণ উকিল-আম্‌লা-চাপরাশী মারফৎ তাঁহার বাসায় গোপনে আসিয়া, আপনাদের সতীত্বের বিনিময়ে আত্মীয়দের মুক্তি অথবা অতি লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া যাইত। চাপরাশির এক বিধবা যুবতী ভগ্নী স্বামিপরিত্যক্তা সধবার ভূমিকা লইয়া মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার কামাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া যাইত। কখনো কখনো বেশ্যা বা অর্ধবেশ্যা জাতীয়া কোন সুন্দরী যুবতীকে ভদ্রঘরের সলজ্জা কুমারী সাজাইয়া হাকিম সাহেবের চক্ষে ধূলা দেওয়া হইত। একবার এইরূপ একটি মেয়েকে ধরিয়া ফেলায় আনায়নকারী চাপরাশি তাঁহার নিকট চাবুক খাইয়া মরে।

এক সময় হাকিম সাহেবের এজলাসে যে ভদ্রলোক পেস্কার ছিলেন, তিনি মারা যান্। আম্‌লাদের মধ্যে প্রায় সমসাময়িক তিনজন ভদ্রলোক পেস্কারি পদ লাভের জন্য তাঁহার নিকট দরখাস্ত পেশ করিলেন। তন্মধ্যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় তদ্বির করিতে আসিয়া, নিম্নস্বরে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার বাড়ির পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী-সম্পর্কিতা একটি পরমসুন্দরী মেয়ে আছে, তাহাকে দেখিয়া স্বর্গের অপ্সরাগণও ঈর্ষান্বিতা হয়। শহরে এক সার্কাস পার্টি আসিয়াছে; রাত্রি সাড়ে আট্‌টার পর আম্‌লা ভদ্রলোকটি সেই মেয়েটিকে হাকিমের বাসায় সার্কাস দেখাইবার নাম করিয়া আনিয়া হাজির করিবেন। তারপর একবাক্স সাবান, একটি এসেন্স ও একখানি সিল্কের রুমাল

দিলেই বোধহয় সে মহাসন্তুষ্ট হইবে। হাকিম সাহেব তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পেস্কারি পদে পরদিন হইতে তাঁহাকেই বসিতে দেওয়া হইবে।...

যথাসময়ে মেয়েটিকে খিড়কির দরজার দিয়া হাকিম সাহেবের শয়নকক্ষে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সত্যই সে লাবণ্যললামভূতা, সত্যই সে ভদ্রবংশীয়া, সত্যই সে অরমিতা কুমারী। হাকিম সাহেব পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার দুইদিন পরে একদিন শশব্যস্ত হইয়া কোতোয়ালী থানার প্রধান কর্মচারি হাকিমের বাসায় ছুটিয়া আসিয়া জানাইলেন, শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক ভদ্রলোকের একটি বিয়ের মেয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। মেয়েটি নাকি হাকিম সাহেবের নবনিয়োজিত পেস্কার—বাবুর কন্যা। হাকিম সাহেব—দারোগা বাবু ও দুইজন পাহারওয়ালা তৎক্ষণাৎ সংবাদবহনকারী দফাদারের সহিত—বাবুর গৃহের অভিমুখে রওনা হইলেন। সারা গৃহ বিবাহ-উৎসবের মঙ্গল সাজে সজ্জিত, লোকজন গিস্ গিস্ করিতেছে; বাড়ির মধ্যে কান্নার রোল উঠিয়াছে। রুষ্ট অভুক্ত বরপক্ষ বিবাহ-সভা হইতে সদ্য প্রস্থান করিয়াছে। পেস্কারবাবুর কন্যা গোয়ালঘরের পার্শ্ববর্তী এক কাঁটাল গাছের ডাল হইতে তাহার রাঙা চেলি গলায় দিয়া ঝুলিতেছে; তাহার পাণ্ডুর ললাটে ও গণ্ডে শ্বেতচন্দনের অলকাতিলকা তখনো জল্‌জল্ করিতেছে। হাকিম সাহেব লণ্ঠনের আলোয় সভয়ে সক্ষেদে চিনিতে পারিলেন—পরশু রাত্রির সেই লাজবিনম্রা বেদনাবিহ্বলা কামোৎসৃষ্টা কন্যাটিকে!

পঞ্চম আলোচনা

শ্যালিকা ও ভগিনীপতি

বাংলাদেশে শ্যালিকা-ভগিনীপতির সম্পর্ক যে কতখানি মধুমাখা—কতখানি স্নেহপ্রীতিপরিহাস-রসে সমুজ্জ্বল, তাহা একমাত্র বিবাহিত বাঙালী ছাড়া আর কেহ জানে না। বিশেষত শ্যালিকা যদি স্ত্রী অপেক্ষা অল্প কনীয়সী, অবিবাহিতা, সুরসিকা ও লীলাচঞ্চলা হয়—তাহা হইলে তো কথাই নাই। শ্যালিকা-ভগিনীপতির এই অসঙ্কোচ অন্তরঙ্গতা ও হাস্যপরিহাসের অবাধ অধিকার এসিয়া তথা ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায় ও সকল পরিবারই ভোগ করে; তবে বাঙালী হিন্দুর মতো বোধ করি এমন কুণ্ঠাহীন আগ্রহে নিবিড়ভাবে কোন জাতিই ভোগ করে না।

অন্য দেশে ও সমাজে ইহাদের আচরণ

এসিয়ার নানা দেশীয় মুসলমানদের মধ্যেও ভগিনীপতির সহিত অবাধে মেলামেশা ও ঠাট্টাতামাসা করিবার স্বাধীনতা স্ত্রী-অপেক্ষা-বয়ঃকনিষ্ঠা কুমারী শ্যালিকাদের আছে। এমন কি বিবাহের পূর্বে কোন কোন অঞ্চলে হবু-জামাইয়ের বাড়িতে যখন তত্ত্ব লইয়া যাওয়া হয়, তখন উহার সহিত এক বা একাধিক ভাবী-শ্যালিকা গিয়া জামাতাকে জ্বালাময় আবদার ও বিদ্রূপে জ্বালাতন করিয়া বেশ-কিছু বখ্‌শিশ আদায় করিয়া আনে। বহু কঠোর পর্দানশীন্ বাড়িতে—যেখানে বড় শালাজগণ জামাতার সম্মুখে বাহির হয় না অথবা বোরখার মধ্যে থাকিয়া দু'টি একটি আবশ্যকীয় কথা বলে—সেখানেও বিবাহিতা ও

অবিবাহিতা শ্যালিকারা তাহার নিকটে আসিলে, বসিলে, হাসিলে ও ভাষিলে গৃহকর্ত্রী রুষ্টা হন্ না। তবে হিন্দু সমাজে ছোটবড় মাঝারি শ্যালিকা-সম্পর্কীয়াগণ বিবাহ-বাসরে ও বিবাহের পরে কান মলিয়া চিম্‌টি কাটিয়া নানা উপায়ে অপদস্থ ও অশোভন ইয়ার্কি করিয়া যতখানি ঢলাঢলি করিয়া থাকে, ততখানি মুসলমান সমাজে বরদাস্ত করা হয় না।

ইউরোপে ও আমেরিকায়—এমন কি আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় শ্যালিকাদের সহিত ঠাট্টাইয়ার্কির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে—অন্তত সাধারণ ভদ্রসমাজে, এবং সে মাত্রাটা হিন্দু সমাজের প্রায়-অনির্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা অনেক কম। ওই সকল দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে শ্যালী লইয়া রসিকতার ঠাঁই নাই বলিলেই চলে। সেক্স-পিয়ার, মোলিয়ের, শিলার প্রভৃতি নাট্যকারদিগের রচনার মধ্যে কোথাও এইরূপ রসিকতা আছে বলিয়া মনে পড়ে না; গলস্‌ওয়ার্দি ও বার্ণার্ড শয়ের লেখার দুই একটি জায়গায় শালী-ভগিনীপতির মধ্যে একটু-আধটু ঠাট্টাতামাসা চলিতে লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সংযত ধরণের, দ্ব্যর্থবোধক ও তীব্র শ্লেষাত্মক। ইউরোপের কোথাও কোন সমাজে শালী-ভগিনীপতি আমাদের দেশের মতো এত নিকটে আসিতে পারে না এবং এতটা মাখামাখি করিবার সুযোগ পায় না। তাহা ছাড়া তথায় খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো, মামাতো, পিস্‌তুতো ভাই-বোনে বিবাহ হওয়া যতখানি সমাজসম্মত বা দেশাচার-বিহিত, আমাদের দেশের মতো স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহার ভগিনীকে বিবাহ করাটা ততখানি সমাজসম্মত বা সুপ্রচলিত নয়।

নির্দোষ পরিহাস যে অনেক ক্ষেত্রে সদোষ ক্রিয়াকলাপের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—হাল্কা ঠাট্টার মধ্যেও মানুষের সত্যকার পরীপ্সা, অপ্রাপ্তিনৈরাশ্য ও সাদনকাম (sadism) যে মুখ লুকাইয়া থাকে, তাহা

ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ফ্রএড না পড়িয়াও অবগত আছেন। সেই জন্য সে দেশের অভিজ্ঞ গৃহস্থেরা কারণে-অকারণে জামাতাকে আদর-যত্ন করিবার জন্য, তাহার সহিত থিএটার-বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবার জন্য অথবা তাহার বাড়ীতে কিছুকাল বাস করিবার জন্য সেয়ানা কুমারী কন্যাকে জামাতার হাতে ছাড়িয়া দিতে ভরসা পান না এবং তাহাকে একান্তে ঠাট্টা-তামাসা করিবার বিশেষ অবসর দেয় না। সেখানকার কৃষ্টিশীল সমাজে উভয়পক্ষই পরস্পরকে যথাসাধ্য এড়াইয়া ও পরস্পরের dignity বজায় রাখিয়া চলে। কচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

এদেশে ঠাট্টাতামাসার বহর ও পরিণতি

এখানে অনেক পুরুষ বিবাহিত-স্ত্রী-অপেক্ষা-সামান্য-বড় শ্যালীকে 'হইলে-হইতে-পারিত-স্ত্রী' বলিয়া ও সর্ববয়সের অবিবাহিতা ছোট শালীকে 'হইলে-হইতে-পারে-স্ত্রী' বলিয়া জ্ঞান ও গণ্য করে; এইরূপ মনে করাকে সমাজ বা লোকাচার প্রশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে না। সত্য সত্যই কাহারো ভাগ্যে স্ত্রী-বর্তমানে অথবা অবর্তমানে কনিষ্ঠা শালীকে বিবাহ করা জুটিয়া যায়। 'বোন সতীনের ঘর' আজকালকার হিন্দু সমাজে সংখ্যায় অবশ্য অনেক কমিয়াছে। কিন্তু এককালে উহা রীতি-মতো লোকপ্রিয় ছিল। মুসলমান সমাজে নবাববাদশা হইতে সচ্ছল গৃহস্থের মধ্যে এ প্রথা কোন কালেই অজ্ঞাত ছিল না, এখনো নয়। Potential bridegroom হিসাবে দুষ্ট জামাতা বাবাজিগণ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত প্রকাশ্য ও অর্ধপ্রকাশ্যভাবে কিশোরী ও উদ্ভিন্নযৌবনা শালীদের সহিত বাক্যে যে লঘু পরিহাস করেন, তাহা অপ্রকাশ্যভাবে যে-কোন মুহূর্তে যে গুরু অপরাধমূলক কার্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা শ্বশুর-শাশুড়ি-দিদিশাশুড়ি-পিস্‌শাশুড়িরা ভাবিয়া দেখিতে ভুলিয়া যান্।

খুনী, ডাকাত, সিঁদেল, জালিয়াৎ, জুয়াচোর, লম্পট, বদমায়েস জামাইও শ্বশুরালয়ে আসিয়া যে স্নেহপ্রীতি-আদরযত্ন-বিশ্বাসবিশ্রান্তি পায়, তাহা স্বর্গের দেবতাকুলও সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহাদের নিকটও সর্ববয়সী শ্যালিকারা নির্ভয়ে আসা-যাওয়া—ইহাদের পাতে খাওয়াদাওয়া—ইহাদের মিথ্যা গৌরবের কথা বলাকওয়া করে। বস্তুত সাধ করিয়া, দায়ে পড়িয়া, অতিরিক্ত কৌতূহলী হইয়া অথবা পরিণাম-সম্বন্ধে বিবেচনাশূন্য হইয়া এদেশে এযাবৎ কত বালিকা যে ভগ্নীপতির নিকট নিজের পবিত্রতা বিসর্জন করিয়া ও বিপন্না হইয়া আসিতেছে, তাহার হিসাব নাই। ভগিনীপতিরাও এই ভাবিয়া সীমা লঙ্ঘনে সাহস পায় যে, নিতান্ত যদি ধরা পড়ে বা কোনো অঘটন ঘটিয়া যায়, তাহাহইলে না-হয় উহাকে বিবাহই করিবে। সকল পক্ষই এসব ব্যাপার এত গোপন রাখে বা রাখিবার চেষ্টা করে যে, উহার শত-করা একটি ঘটনার কথাও কখনো গৃহপার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। নিতান্ত বিপদে না পড়িলে বা কুরুচিকর বোধ না হইলে, শ্যালিকারাও ভগিনীপতির কুব্যবহারের কথা মা-ঠাকুরমাদের কানে দেয় না। শ্যালিকা সধবা বা বিধবা হইলে কচিৎ ব্যভিচারী ভগিনীপতিকে আদালতে টানিয়া আনা হয়। প্রায়শ মেয়ের মুখ চাহিয়া অসদাচরণকারী জামাতার অনেক কিছুই শ্বশুরালয় মুখ বুজিয়া সহিয়া থাকে।

'প্রজাপতির নির্বন্ধে' বা 'চিরকুমার সভায়' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভগিনীপতি এবং বিধবা ও কুমারী শ্যালিকাদিগের মধ্যে যে পরিহাস-পূর্ণ সংলাপের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অবশ্যই উচ্চাঙ্গের witএর বিদ্যুচ্ছটা আছে এবং তাহার তলে তলে গভীর প্রীতি, পরমাত্মীয়তা-বোধ ও অখণ্ড বিশ্বাসের সুনির্মল ধারা বহিতেছে। তথাপি এই ধরণের কথোপকথন একজন রসজ্ঞ, শিক্ষিত ও সুমার্জিত

ইউরোপীয়ান্ শুনিলে ঈষৎ লজ্জিত তো নিশ্চয়ই হইবেন, পরন্তু পরিপূর্ণ মাত্রায় ইহার মর্মগ্রহণ করিতে অপারগ হইবেন। কবিগুরুর ভ্রাতুষ্পত্র সুরেন্দ্রনাথ যখন চিরকুমার সভা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি এই আশঙ্কা করিয়াই ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিষেধ করেন।

"প্রজাপতির নির্বন্ধ" হইতে দুই-চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইতে চাই যে, অতিশয় সভ্য ও ভব্য বাঙালী পরিবারে শ্যালী লইয়া কিরূপ ঠাট্টা-তামাসা চলিতে পারে। উপন্যাস ও নাটকে—বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের হস্তে—এই সকল বাক্যালাপ যতখানি সুমার্জিত, রসসমৃদ্ধ ও ভাবঘন হইয়াছে, বাস্তবজীবনে অবশ্য ততখানি আশা করা যায় না।

বইয়ের একেবারে গোড়ার দিকে পুরবালা তাহার স্বামী অক্ষয় মুখোপাধ্যায়কে নিজের দুইটি অবিবাহিত (উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে অরক্ষণীয়া বলিয়া বিবেচিতা ১৪ ও ১৬ বৎসর বয়স্কা) ভগ্নী দুইটির জন্য সম্বন্ধ দেখিবার তাগিদ দিয়া বলিতেছে—"তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে।....ওরা আমার বোন্ কিনা"—

অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, "মানবচরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে ও স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না—এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে স্বীকার করতে হবে।"

[এইটুকু বহু জামাতার সংগুপ্ত বাসনার সত্যকার প্রতিধ্বনি।]

অবিবাহিতা শ্যালিকাদ্বয়ের সর্বকনিষ্ঠা নীরবালা তাহাদের দুইজনকে দুই জায়গা হইতে দেখিতে আসিতেছে শুনিয়া ভগিনীপতিকে

বলিতেছে—"আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্যে মশায়।"

উপরের বোন নৃপবালা বলিতেছে, "আঃ কী বর-বর করছিস্। দেখো তো ভাই মেজদি।"

অক্ষয় বলিতেছেন, "ওকে ওই জন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন তবু তৃপ্তি নেই?"

চতুর্দশী নীরবালা বলিল, "সেইজন্যেই তো লোভ আরও বেড়ে গেছে।"....

স্ত্রী পুরবালা যখন দুইটি অনূঢ়া ও একটি বালবিধবা ভগ্নীকে গৃহে রাখিয়া কাশী বেড়াইতে গিয়াছে, তখন প্রথমোক্তা শ্যালী দুইটির সহিত নির্দোষ রহস্যালাপ করিতে করিতে অক্ষয়বাবু একস্থলে বলিতেছেন, "মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তাহলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হ'ত?"....ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবিশেষে শ্যালী-জামাইবাবুর ঠাট্টাতামাসা বাস্তবজীবনে কত নিম্নস্তরে নামে, কতদূর গড়ায় ও কোথায় আসিয়া থামে, তাহার খবর আমরা কিছু কিছু সকলেই রাখি, কিন্তু হয়তো অনেকখানি রাখি না। কনিষ্ঠা শ্যালিকাদের সহিত জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতিদের কার্যকরী তামাসা কি অনিষ্টসাধন করিতে পারে ও করিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের অনেকেরই বোধ হয় বেশী জানা নাই। পাড়ায় বা বাড়ির পাশে কোন ব্যাপার ঘটনাচক্রে নজরে পড়িলে বা গুপ্তপ্রণয়-জনিত কোন দুর্ঘটনা চাপা দেওয়ার উপায় না থাকিলে, তবে আমরা জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে কোন পক্ষই ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবীর নিকটও সহজে সত্যভাষী ও স্বীকারোক্তিপ্রবণ হইতে চাহে না। অনেকেরই জীবনে এতৎসম্পৃক্ত ক্ষুদ্রবিচ্যুতিমূলক ঘটনা আমরণ

সংগুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় রহিয়া যায়; কাহারো জীবনে ইহা অশান্তিময় দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা জাগাইয়া রাখে। কোনো কোনো নারীর জীবন অশ্রুনিষিক্ত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। অনূঢ়া কন্যাদের জীবন এই পদ্ধতিতে প্রনষ্ট হইতে দেওয়ার মূলে পিতামাতাদের বিষয়বুদ্ধিহীনতা ও অসন্দিগ্ধতাই শুধু কার্য করে না, ঐ সঙ্গে কার্য করে যুগযুগাচরিত দেশাচার ও কুলাগত প্রথা। কোন কোন কুমারী, তরুণী এবং প্রায় সমস্ত বিবাহিতা ও বিধবা শ্যালিকাদের আত্মদানের মূলে প্রধানত থাকে অতৃপ্তকামনা, স্বীয় ভগ্নীর প্রতি সংবৃত ঈর্ষা, ভগিনীপতিদের আর্থিক প্রলোভন বা অন্যবিধ সাহায্যলাভের উদ্দেশ্য।...

এইবার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের বক্তব্যকে উপপন্ন করিয়া দিতে চাই। নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনা আমার এক পরম স্নেহভাজন শিষ্য বৎসর তিনেক পূর্বে লিখিয়া জানাইয়াছিল। শুধু নায়কের নাম ঈষৎ বদ্‌লাইয়া তাহার ভাষা যথাযথ অধ্যাহার করিয়া দিতেছি।—

তপেনের বিধবা ও সধবা শ্যালিকাযুগল

"তপেন বলে একটি বন্ধু (বয়স ২৬ বছর) আজ প্রায় তিন বছর হল বিয়ে করেছে। স্ত্রী তার চেয়ে প্রায় তিন বছরের ছোট। বিবাহের দুই বছর পরে তার স্ত্রী আঁতুড়-ঘরে আশ্রয় নেন্। সেই সময়ে তার বিধবা ছোট-শালী তার স্ত্রীকে সাহায্য করতে আসেন। এই মহিলা অতিমাত্রায় শুচিবায়ুগ্রস্তা; গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, সর্বদা ঠাকুরদেবতার নাম মুখে লেগেই আছে। পুরুষদের সামনে বেরোন্ না, এমন কি তপেনের কাছেও নয়। এই মহিলাটি একটি বিশেষ দুর্বল মুহূর্তে তপেনের কাছে দেহদান করেছিলেন। একবার নয়—ছ'বার। তপেন বলে—বিবাহের পর প্রথম সহবাসে স্ত্রীর ওপর যতটুকু বলপ্রয়োগ করতে হয়, তার বেশী বলপ্রয়োগ সে করেনি।

"তার পর তার স্ত্রীর নিউমোনিয়ার সময়ে তার অপর এক দূরসম্পর্কীয়া বড় বিবাহিতা শালী তাদের বাড়ী আসেন। হাস্যে লাস্যে সে নিজেই উপযাচিকা হয়ে তপেনের হাতের মধ্যে এসে পড়ে। নিজে প্রতিরাত্রে (যতদিন ছিল—প্রায় ১৭।১৮ দিন) সে তপেনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য! সামান্য চুম্বন, অংগমর্দনাদি ছাড়া তপেন তার কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করতে পারেনি।

"কিন্তু তারপর থেকে তপেনের স্ত্রীর ওপর বিরূপতা আসে এবং স্ত্রীর সুস্পষ্ট তাগিদ সত্ত্বেও সে যৌন সম্মিলনে মন দিতে পারেনি। এমন কি, এক বছরের মধ্যে মাত্র বার ২৫শেক ছাড়া সহবাসই করেনি। অথচ শয্যায় সে স্ত্রীকে সোহাগ-আদর করতে ত্রুটি করেনি কোনদিনও, শুধু সংগমের সময় তার বিতৃষ্ণা আস্‌তো।

"ক্রমে তপেনের মাথাধরা, মাথাঘোরা রোগ প্রবলভাবে দেখা দিল। সে স্বাভাবিক হাসিতামাসা ছেড়ে গম্ভীর হয়ে পড়ল। যে তপেন sex book পেলে নড়ত না, সে ধর্মপুস্তক পড়্‌তে আরম্ভ করল। শেষে অম্বল, হাঁপানি ইত্যাদি। এখন স্ত্রীপুত্র নিয়ে চেঞ্জে গেছে।"

ডাঃ শরৎ বসু ও তাঁহার বিধবা শ্যালী অসীমা

গত ১৩৪৪ সালের প্রথম ভাগে ডাঃ শরৎকুমার বসু নামক এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শিবরাণী বসু এক খোরপোষের মামলা দায়ের করেন—তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর. গুপ্ত, আই. সি. এস. মহোদয়ের এজলাসে। মামলায় প্রকাশ পায় যে, ডাঃ বসু বিবাহের পর হইতেই দুশ্চরিত্র ও স্ত্রীকে অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। স্ত্রীর চক্ষের সম্মুখে অনেক সময় তিনি মদ্যপান ও ব্যভিচার করিতেন, স্ত্রী কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহাকে মারধর্ করিতেন। সাত বৎসর পূর্বে তাঁহার এক বিধবা ভগ্নী

তাঁহাদের বাসায় বেড়াইতে আসে ; ডাঃ বসু তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার সতীত্বনাশ করেন এবং তাহাকে নিজের বাড়িতে স্ত্রীর জ্ঞাতসারে রক্ষিতারূপে পোষণ করিতে থাকেন। স্ত্রীর প্রবল আপত্তিতে ও অবিরল অশ্রুজলে কোন পক্ষই চঞ্চল বা প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভগিনীকে বাড়ি হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি স্বামীর নিকট প্রহৃতা হইতেন ; তাঁহার পুত্রকন্যাদের উপরও নির্যাতন চলিত। কিছুকাল পূর্ব হইতে ডাঃ বসু তাঁহার বিধবা শ্যালী অসীমাকে লইয়া ক্যালকাটা হোটেলে পরম আরামে কালাতিপাত করিতেছেন। এদিকে শিবরাণী তাঁহার কয়টি অপোগণ্ড পুত্রকন্যা লইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন ; তাঁহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসাভাড়া দিবার ক্ষমতা নাই। মামলার সময় অসীমার বয়স ছিল ত্রিশ।

বাদিনী পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত অরুণাভ সেনগুপ্তের জেরার কতকাংশ আদালতের নথি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহাতেই ডাঃ শরৎ বসুর চরিত্র ও কীর্তিকলাপের কতকাংশ প্রকাশ পাইবে, অপ্রকাশিত অংশটুকুও অনুমানে সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য হইবে না।

প্রশ্ন। আপনি একজন বদ্ধ মাতাল ও লম্পট কি না ?

কোন উত্তর নাই।

—আপনি একজন নৈতিক চরিত্রহীন লোক কি না ?

—না।

—আপনি কি পৃথিবীর মধ্যে একজন সম্পূর্ণ-দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক নন্ ?

—না।

—সমাজে আপনার জারজ সন্তানদের স্থান কোথায় তাহা কি আপনি ভাবেন ?

—না।

—নগরীর গণিকালয়গুলিতে কি আপনার যাতায়াতের কদভ্যাস ছিল ?

—কখনো না।

—একথা কি সত্য নহে যে, লাহোরে যখন আপনার তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন কলিকাতা হইতে আপনি সুখিয়া নাম্নী এক দাসীকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—এ কথা কি ঠিক নহে যে, আপনি উক্ত দাসীর সহিত পাপাচরণে লিপ্ত হন্ এবং আপনার ঔরসে উহার গর্ভে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে ?

—না।

—সাবিত্রী নাম্নী এক বেশ্যার নিকট আপনি যাইতেন একথা কি সত্য ?

—না।

—একথা কি সত্য যে, সুসি নাম্নী এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ নার্সের প্রতি আপনার অনুরাগ ছিল এবং আপনি মাঝে মাঝে তাহাকে নানাপ্রকার উপঢৌকন দিতেন ?

—হ্যাঁ।

—এইগুলি কি আপনার নিকট সুসরী লিখিত চিঠি ?

—হইতে পারে।

—'হইতে পারে' কথা আমরা বুঝি না। হাঁ কি না স্পষ্ট জবাব দিন। আপনি সুসীর নিকট হইতে এই চিঠিগুলি পাইয়াছেন কিনা বলুন।

—হ্যাঁ।

—এ কথা কি সত্য নয় যে, আপনি আপনার রক্ষিতা অসীমাকে লইয়া ক্যালকাটা হোটেলে আছেন এবং তথায় মদ্যাদি পান করেন?

—না।

—অসীমা কি আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার চেয়ে বয়সে ছোট?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি অসীমার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে দুষ্কার্যে প্ররোচিত করেন নাই?

—না।

—নতুবা অসীমা কি আপনাকে প্ররোচিত করিয়াছে?

—না।

—সে কি স্বেচ্ছায় আপনার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে?

—হাঁ, সে তাহাই করিয়াছে।

—এ কথা কি সত্য নহে যে, আপনার দ্বারা অসীমার গর্ভে তিনটি সন্তান হইয়াছে?

—হাঁ, তাহাদের মধ্যে দুইটি মারা গিয়াছে।

—অসীমা কি পুনরায় গর্ভবতী?

—হাঁ।

—আপনি কি শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন?

—না।

—সে কি আপনার রক্ষিতা?

—হাঁ, সে আমার অনুগৃহীতা প্রণয়িনী।

—অন্যান্য পিতার ন্যায় আপনি কি আপনার সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

—আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ছেলেরা ভালো নয়।

—মদ্য সম্বন্ধে আপনার রুচিবোধ আছে—না? ফরাশী শ্যাম্পেন ও বিলাতী হুইস্কিই আপনার প্রিয় নহে কি?

—আমি আজকাল মদ্যপান করি না, যখন করিতাম তখন বিদেশী মদ্যই ব্যবহার করিতাম।...

বলাবাহুল্য, আদালত শিবরাণীকে খোরপোষের ডিক্রী দেন্। কিন্তু প্রথম কয়েক দফা খোরপোষের টাকা আদায় দিবার পর ডাঃ বসু স্ত্রীপুত্রদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন্। ভাগ্যাহতা মহিলাটীকে পুনরায় সজলনয়নে আদালতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল।....

সুস্মিতার আত্মকাহিনী

সুস্মিতা অবশ্য মেয়েটির আসল নাম নয়। আগে আমরা যে পাড়ায় থাকিতাম, সেই পাড়ায় মেয়েটির পিত্রালয়। মেয়েটি আমার স্ত্রীকে কাকীমা বলিয়া ডাকিত এবং মাঝে মাঝে দুপুর বেলায় আসিয়া গল্প করিত, বড় মেয়ের নিকট সেলাই শিখিত, দুই মেয়েকে গান শুনাইত বা শিখাইত। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পর কিছুদিন পর্যন্ত মাঝে মাঝে সকাল বেলায় আসিয়া হাজির হইত স্ত্রীর নিকট রান্না শিখিবার জন্য। তাহাদের বাড়িতে উড়িয়া পাচক রান্না করে—তাহার কাছে শিখিবার কিছু নাই, তাহাকে শিখাইবার যথেষ্ট আছে। তাহার রন্ধন খাইতে সুস্মিতার ঘৃণা করে। তাহার মাতা নিজের অম্বলের ব্যায়রাম, রুগ্ন শিশুদের তত্ত্বাবধান, পিতার সহিত তর্কাতর্কি ও আহ্নিক লইয়া দিবারাত্র বিব্রত থাকেন। সুস্মিতা ভালো রান্না শিখিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির সকলকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে মনস্থ করিয়াছিল।

বেশ ফর্সা রঙ, ট্যাবাটোবা দোহারা গড়ন। সারা দেহে কেমন একটা আল্‌গা চটক্ লাগানো আছে। ঠোঁট দুটি একটু পুরু, কপালটা একটু চওড়া, নাকটি খুব টিকালো নয়; তবু মুখখানার—

বিশেষভাবে অতল কুতূহলভরা চোখদুটির মধ্যে কি যেন একটা মায়ার ফাঁদ পাতা। খুব লজ্জাশীলা খুব বিনম্র নয়; খট্ খট্ করিয়া চলে, যাহা মনে আসে চট্‌পট্ করিয়া বলে, চট্ করিয়া কথা বুঝিয়া ফেলে। পশারপ্রতিপত্তিশালী আইনজীবীর মেয়ে সে। বড় ভাইগুলির একজন বড় চাকুরে ও অন্যজন ব্যবসায়ী। কলিকাতা শহরে নিজেদের মাঝামাঝি আকারের বাড়ি ও নিজেদের মোটর গাড়ি আছে। কিন্তু কোথাও মেয়েটির জাঁকজমক নাই, আত্মীয়স্বজনের গর্ব নাই, নিজের রূপস্বাস্থ্যশিক্ষা সম্বন্ধেও সে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। মেয়েটিকে আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সকালের দিকে আসিলে, তাহাকে ভাত না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না।

সে যখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে, তখন তাহার দিদি ও ভগিনীপতি তাহাদের বাড়িতে মাসখানেকের জন্য আসিয়া থাকেন। এই দিদিটি তাহার চেয়ে অন্তত ১৭।১৮ বৎসরের বড় এবং ভগিনীপতিটি অন্ততঃপক্ষে ত্রিশ বৎসরের বড়। ইনি এতকাল মফস্বলে মফস্বলে সরকারী চাকুরি উপলক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; সম্প্রতি কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন স্থানে হঠাৎ বদ্‌লি হওয়ায় বাক্সবিছানা লটবহর লইয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়া পড়িয়াছেন। সেখানে মাসখানেক থাকিয়া তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় সুবিধামতো ও পছন্দসই একটি বাসা ভাড়া করেন এবং সেই বাসায় উঠিয়া যান্। তাঁহার স্ত্রীটি সচ্ছল অবস্থাপন্ন স্বামী পাইয়াও বৎসরের মধ্যে অন্তত ৩।৪ মাস কাল বাপের বাড়ি আসিয়া কাটাইত; যেবার গর্ভবতী হইত, সেবার প্রসবের নিমিত্ত আসিয়া কম করিয়া ছয় মাস কাটাইয়া যাইত।

সুস্মিতা আমার স্ত্রীকে বহু পূর্বেই কথাপ্রসঙ্গে গোপনে বলিয়াছিল যে, দিদি বোধ হয় স্বামী পাইয়া খুব সুখী নয়। জামাইবাবু অত্যন্ত কৃপণ ও স্বার্থপর; বোধহয় তাঁহার স্বভাবচরিত্রও ভালো নয়। দিদির

সহিত মাঝে মাঝে তাঁহার তুল্‌কালাম ঝগড়া বাধে। দিদি একবার ঝগড়া করিয়া প্রায় আট মাস বাপের বাড়ী ছিল ও অমন স্বামীর মুখদর্শন করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তখন সুস্মিতা ছেলেমানুষ, দিদির এত রাগের কারণটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

বৎসর ৪।৫ পূর্বে আর একবার দিদি গর্ভবতী হইয়া যখন বাপের বাড়ি আসে, তখন মা ও দিদির মধ্যে জামাইবাবু সম্পর্কে একান্তে কথোপকথনের খানিকটা সে লুকাইয়া শুনিয়াছিল। তাহাতে সে বুঝিয়াছিল যে, জামাইবাবু শহরের এক উকিল ও রেজিস্ট্রারের সহিত প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় গণিকালয়ে যান্ এবং রাত্রি একটা-দুইটার সময় ফিরিয়া আসেন। তাহা ছাড়া দিদি যখন কলিকাতায় চলিয়া আসে, তখন বাসার এক চাকুরানির বিধবা ছোট বোনকে বৈঠকখানায় আনাইয়া তাহার সহিত রঙ্গরস করেন। জামাইবাবুর এক বিধবা বউদি লুকাইয়া লুকাইয়া এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। সেইজন্য ঝি কামাই করিলে, আসিতে বেলা করিলে এবং বাড়ির গৃহিণীদ্বয়ের সহিত বচসা করিলে, কর্তা তাহাকে কিছুই বলেন না।

বিবাহের প্রথম আট বৎসরের মধ্যে দিদির ছয়টি গর্ভ হয়; তাহার মধ্যে তিনটি মৃতপ্রসব, দুইটি অকালে বিনষ্ট ও একটি মাত্র জীবিত-প্রসব হয়। প্রতি গর্ভের সময় ও প্রসবের পর কিছুকাল পর্যন্ত দিদি জীবন্মৃত হইয়া থাকিত। মাতা তাহাকে কোনো ফকিরের মাদুলি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইহার পরও দিদির একটি গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। তারপর পিতা মেয়েকে এক বড় ডাক্তারের কাছে লইয়া যান্। তিনি উহার রক্ত পরীক্ষা করাইয়া দেখেন যে, উহার মধ্যে দোষ আছে; ঐ দোষ অসচ্চরিত্র স্বামীর সংসর্গে ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার বাবু দিদিকে ইঞ্জেকশন্ দিয়া ভালো করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জামাই বাবুর রক্ত পরীক্ষা করাইতে ও তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসা

করাইতে বলেন। বাবা জামাইবাবুকে রক্ত পরীক্ষা করাইবার বিনীত ইঙ্গিত করায় তিনি ভীষণ চটিয়া যান্ এবং তাঁহার চরিত্র লইয়া কাহারো মন্তব্যকে তিনি বরদাস্ত করিবেন না বলিয়া বাবাকে শাসাইয়া দেন্। যাহা হউক, ইহার পর দিদির যে দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে, তাহারা সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে।

সুস্মিতা ম্যাট্রিক ক্লাস হইতেই আমাদের বাড়িতে আসা কমাইয়া দিয়াছিল। পরীক্ষা দিবার পর মাস দুই-আড়াই সে একটু ঘন ঘন আসিয়াছিল; তারপর সে কলেজে ভর্তি হইয়া আসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিল। ফার্স্ট ইয়ারে পড়া শেষ করিতে না করিতেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন স্থানের এক ধনবান ব্যবসায়িপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। ছেলেটি বি-এ পর্যন্ত পড়িয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে; পড়াশুনায় সে কখনো মনোযোগী বা প্রখরমেধ ছিল না। পিতার সদাগর আফিসে খেয়ালমতো কখনো কখনো বাহির হয়। ছেলেটি দেখিতে নিরেস শ্যামবর্ণ, ঈষৎ খর্বাকার ও রোগাটে ধরণের। এককালে ভালো ফুটবল খেলিতে পারিত। মুখের মধ্যে সূক্ষ্ম জোড়া ভুরুর নীচে টানা চোখ দুটি ও চিবুকটি লক্ষ্য করিবার মতো। বিবাহে আমরা দুইজনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম।

বিবাহের দিন পাঁচ-সাত পরে সুস্মিতা একদিন ও মাস চার পাঁচ পরে আর একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহার একটি কন্যাসন্তান জন্মে। বিবাহের পর প্রথম যেদিন সে আমাদের বাড়িতে আসে, সেদিন সে আমার পড়ার ঘরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কুশলপ্রশ্ন করিয়া যায়। রঙ্ যেন তাহার ফাটিয়া পড়িতেছে। হাসি-হাসি মুখখানিতে যেন স্বর্গের সারল্য মাখানো, উৎফুল্ল যৌবন যেন তাহার জড়োয়ার অলঙ্কাররাশি ও বেনারসী শাড়ির ঔজ্জ্বল্যকে হতমান করিয়া দিয়াছে।

মেয়ে হওয়ার মাস কয়েক পরে হঠাৎ শোনা যায় সুস্মিতা অত্যন্ত অসুস্থ; তাহার খুড়শ্বশুর ও খুড়শাশুড়ি তাহাকে লইয়া মধুপুর গিয়াছেন। মধুপুরে অবস্থান-কালে সে আমার স্ত্রীকে দুইখানা সুদীর্ঘ পত্র লেখে। পরে তাহার পিতা যখন তাহাকে ভালো চিকিৎসার জন্য নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখেন, তখন সে শয্যাশায়ী, তাহাকে গোল্ড ইঞ্জেকশন্ দেওয়া চলিতেছে। সেই সময় আমার স্ত্রী একদিন তাঁহাকে দেখিতে গেলে, সে কক্ষ হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া আমার স্ত্রীকে একান্তে শ্রান্তস্বরে গুটিকয়েক গোপনীয় কথা বলে। সেইগুলি তাহার শেষ কথা। এ. পি. করিবার মাস দুইয়েক পরে সুস্মিতার অমূল্য জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়।....

তাহার দুইখানি পত্রের অংশবিশেষ ও আমার স্ত্রীর সহিত তাহার অন্তিম আলাপের কিয়দংশ একত্র করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"দিদির যখন বিয়ে হয় তখন আমি শিশু, বোধহয় সবে জন্মেছি। চার-পাঁচ বছর বয়সে দিদিকে চিন্লুম, জামাইবাবুকে চিন্লুম। দিদি তখন প্রথমবার কি দ্বিতীয়বার খালাস হতে এসেছে বাপের বাড়ি। তার প্রসবের সময় হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, সাহেব-ডাক্তার এসেছিল মনে আছে। কিছুদিন পরে জামাইবাবু এলেন। দিদির কোল কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না; কিন্তু জামাইবাবু এসে আমায় কোলে নিলেন। বাবার কোলে চড়েছি প্রাণ ভরে, কিন্তু ছেলেবেলায় আর কোন পুরুষমানুষের কোলে চড়েছি বলে মনে পড়ে না। একটা টেরি-কাটা ছোকরা চাকর ছিল, অল্পক্ষণ কোলে নিয়ে আমায় হঠাৎ নামিয়ে দিত; বল্ত—মেয়েছেলেকে

কোলে নিতে আমার ঘেন্না করে।....তার ওপর ভীষণ রাগ হ'ত তখন।

"মা সংসারের তালে কতটুকুই বা কোলে করতেন আমাদের! তবে বাবা কোর্ট থেকে এসে পাঁচছ বছর বয়স পর্যন্ত আমায় অনেকক্ষণ কোলে বসিয়ে আদর করতেন, খেল্‌না দিতেন, লজেঞ্জেস্ দিতেন।

"জামাইবাবু সেবার কদিন ছিলেন আমার মনে নেই। কিন্তু যে কদিন ছিলেন আমায় কোলে বসিয়ে ঠোঁটে গালে চুমু খেতেন; কত মিষ্টি কথা বলতেন আর হেসে হেসে জিগ্যেস করতেন—সুসি, বিয়ে করবি আমাকে? সেই বয়সে কিছু তো বুঝতুম না, ভাবতুম জামাইবাবু বাবার মতোই বোধহয় আমাদের আপন জন, সেই বাবু-চাকরটার মতো বজ্জাৎ নন্; ওঁর আদর আমার ভালো লাগত, ওঁকে বিয়ে করতেও ইচ্ছে যেত। বিয়ে করাটা কি আর এমন শক্ত?

"তারপর জামাইবাবুকে আর কতদিন দেখেচি বা দেখিনি তা আমার মনে পড়ে না। আমার দশ বছর বয়সের সময় জামাইবাবু আর দিদি আমাদের বাড়িতে আসেন। দিদিকে আর একটি বোনপোকে রেখে তিনি দিন তিনচারেক বাদে চলে যান। যে কদিন ছিলেন তিনি, কেবল আমায় কোলে বসিয়ে আদর করতেন; গায়ে সুড়সুড়ি দিতেন, কেউ সামনে না থাকলে চুম্বন করতেন্। আর কানে কানে বল্‌তেন,—সুসি, কবে বিয়ে করবি আমায় বল্‌লি না? মিচ্‌কে হেসে চুপ করে থাক্‌তুম; বেশী জ্বালাতন কর্লে বল্‌তুম—দাঁড়ান, আগে একটা পাস কোরে নিই।....তাঁর আদর আমার লাগ্‌ত ভালো। কিন্তু এতটা আদর যে ভালো নয় তা একটু বুঝতে শিখেছিলুম। তিনি লুকিয়ে চুম্বন করতেন বলে আমার আরো ভালো লাগ্‌ত—সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত; তখন শুধু মনে হত—আর কেউ না দেখুক্, দিদি একবার দেখুক।

"একদিন বিকেল বেলা তিনি দোতলা বাসে চড়িয়ে আমাকে লেকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন; সেখানে যেতে যেতে আমায় সল্টেড্ বাদাম খাওয়ালেন। সন্ধ্যার সময় লেকের এক নির্জন প্রান্তে তিনি আমাকে অঙ্কের ওপর বসিয়ে যে সব বিলসন কল্লেন, তাতে আপত্তি করার প্রবৃত্তি হয়নি আমার। কি রকম মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলুম আমি। তবে মনে হয়েছিল এগুলো করা ও সওয়া দুটোই অন্যায়। তারপর জামাইবাবু চকোলেট কিনে আমার হাতে দিয়ে বাসে উঠে যখন কানে কানে বল্লেন যে, তিনি আমার দেহ নিয়ে যে সব ক্রীড়া কর্‌লেন তার কথা যেন কাউকে না বলি—এমন কি আমার দিদিকেও নয়, তখন বুঝলুম যে, তিনি নিশ্চয় ঘোর অন্যায় কাজ করেছেন। তবু সে অন্যায়কে আবেশের ঘোরে আমার দেহ বরণ করে নিলে।

"দিদিকে আমি কোনদিনই পছন্দ করতুম না। ছেলেবেলা থেকে মনে হত সে আমায় ভালবাসে না, দেখতে পারে না। কখনো সে আমার হাতে কিছু খাবার দিয়েছে বলে মনে পড়ে না; বরং মাঝে মাঝে বকেছে, চড়চাপড় মেরেছে। দিদি আমার ছেলেবেলায় যখনি বাপের বাড়ি এসেছে তখনি মার কাছে বসে বসে শ্বশুর-বাড়ীর গল্প করত, জামাইবাবু তাকে কি কি নতুন গয়না গড়িয়ে দিয়েছে—কি কি কাপড় কিনে দিয়েছে বাক্স খুলে দেখাত। জামাই-বাবুর গর্বে সে যেন ফেটে পড়্‌ত; তার যে কোথাও অভাব আছে তা দেখে মনে হ'ত না। অথচ বাপের বাড়ী এসে সে যেভাবে মুখ চালাত আর ছেলেটাকে সময়ে-অসময়ে ঢক্ ঢক্ করে দুধ গেলাত, তাতে মনে হত তারা মায়েপোয়ে জামাইবাবুর বাড়ীতে বোধ হয় পেট ভরে খেতে পায় না। বাবা আফিসে যাবার সময় সে নিত্যি নতুন জিনিস কিনে আনবার ফরমাস কত্ত। শ্বশুরবাড়ী ফিরে

যাবার সময় সে বাবার পয়সায় একরাশ জিনিস কিনিয়ে বাক্স ভর্ত্তি করে নিয়ে যেত। একবার আমায় না জানিয়ে আমার একটা দামী গান-গাওয়া জার্মান পুতুল, আর একবার বাবার একটা সখের রূপো-বাঁধান ছড়ি নিয়ে গেছল। ঝিচাকরদের পুজো-পার্ব্বণে কখনো দিদি একখানা কাপড় বা একটা টাকা বকশিশ দেয় নি। ভারী রাগ হত দিদির এই আদেখ্‌লেপনা আর ছোট নজর দেখে।

"কিছুদিন বাদে জামাইবাবুর বিধবা বউদি জামাইবাবু আর দিদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কলকাতা তাঁর বাপের বাড়ি চলে আসেন। একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে তিন দিন থাক্‌লেন। মায়ের মামাবাড়ীর দেশের মেয়ে ইনি; দিদির বিয়ের আগে থেকেই মায়ের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল এঁর। মার ঘরে আমি আর আমার এক ছোট ভাই শুতুম। তিনি রাত্রিকালে মার বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলতে লাগ্‌লেন—তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া আটন' হাজার টাকা জামাইবাবু কিভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আত্মসাৎ করেছে, তাঁকে খাওয়াপরার কি রকম কষ্ট দেয়। তা ছাড়া তাঁর একমাত্র ছেলেটি—যে পুসায় এগ্রিকাল্‌চার পড়ে—তার মাসিক খরচ নিয়মিতভাবে পাঠায় না। এর পর তিনি ওঁর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলো কথা মাকে শুনিয়ে দিলেন। মা তো সে সব কথা বিশ্বাস করতেই চান না। কথাগুলো কি তা আপনাকে একদিন বলেছিলুম—আপনার মনে আছে বোধ হয়?

আমি জেগে জেগে অন্ধকারে আলাদা বিছানায় শুয়ে সব শুন্‌ছিলুম্; শুনে জামাইবাবুর ওপর রাগে আর ঘেন্নায় শরীরটা রীরী করতে লাগল। তবু দিদিটা জব্দ হয়েছে বুঝে মনে খানিকটা আশ্বস্তি এল। মহিলাটি শেষে বললেন, "আপনার মেয়েটি, মাওই মা, একেবারে বোকার শিরোমণি। স্বামীর ওপর জোর খাটাতে জানে না,

অভিমান করতে জানে না, তাকে বশ কর্‌তে জানে না। যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, তখন বিছানায় শুয়ে হাউ হাউ করে শুধু কাঁদে। আবার একখানা গয়না কি একখানা দামী কাপড় কিনে দিলে সব ভুলে যায়।"...

"সেই বছর তিনেক আগে যখন ম্যাট্রিক পড়ি, সেই সময় কল্‌কাতায় দিদি আর জামাইবাবু তাঁদের কটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন জানেন নিশ্চয়। হিন্দু নারীর পবিত্র কৌমার্যের মূল্য কতখানি তার বোধ আমাদের রক্তের মধ্যে থাকা উচিত। কাকীমা, আমারও তা ছিল। কিন্তু কি জানি কি হ'ল। যুগযুগান্তের এই শিক্ষার ছাপ্‌কে আমি মুছে ফেল্‌তে দিয়েছিলুম। আমি দোষী স্বীকার করি, কিন্তু আপনি বুঝ্‌তে পারেন কাকীমা—পুরোপুরি নই। চার-পাঁচ বছর বয়সে অত কি বুঝ্‌তুম? দশ বছরে খানিকটা বুঝ্‌তুম, কিন্তু তখনো দেহের আনন্দ ভালোমন্দ রাস্তা বাছ্‌তে শেখেনি।...

"একটা মানুষকে একসঙ্গে কি করে খুব ভালবাসা আর খুব ঘৃণা করা যায়—তার দৃষ্টান্ত আমার ওই জামাইবাবুটি।

"রোজ বিকেলে একটু একটু জ্বর হয়; কবিরাজে সূতিকার ওষুধ দিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় সূতিকা নয়, আরো খারাপ অন্য কিছু। অনেক ভুগ্‌তে হবে আমাকে, শেষে ভুগে ভুগে মরতে হবে। মন আমার অহরহ তাই বলছে। আর বাঁচতেও সাধ নেই। একটু ভালো বোধ হলে বই পড়ি, চিঠি লিখি। দোহাই কাকীমা, আমি বেঁচে থাক্‌তে কাকাকে কিছু বলবেন না। চিঠিখানা পড়ে ছিঁড়ে ফেলবেন। উনি আমাকে নিশ্চয়ই খুব ভালো মেয়ে বলেই জানেন।

হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। সমাজের চোখে ধর্ম্মের চোখে আমি পাপী। পাপী ৪।৫ বছর থেকে। তখন অবিশ্যি পাপ কাকে বলে জান্‌তুম না।

দশ বছর বয়সেও তাই। অন্যায় কাকে বলে জানতুম এবং সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছিলুম ও উপভোগ করেছিলুম। ষোল বছর বয়সে যখন জামাইবাবু আমাদের বাড়ীতে একমাস ছিলেন, তখন দিদির সামনেই আমার সঙ্গে এমন সব ঠাট্টা করতেন যেগুলোতে আমার লজ্জা পাওয়া আর দিদির আপত্তি করা উচিত ছিল।

"সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় দিন তিনেক শয্যা নিয়েছিলুম। সে সময় জামাইবাবু প্রায় নাওয়া-খাওয়া বন্ধ রেখে আমার শয্যাপার্শ্বে বসে থাকতেন; বারণ কল্লেও গা হাত পা কপাল টিপ্‌তেন। তখন সত্যি আমার ভারী লজ্জা করত। মাবাবার সামনেই তিনি আমায় ওষুধ খাওয়াতেন, থার্মোমিটার দিতেন, করপুট নিয়ে খেলা করতেন্। বাপমা দেখে মহাখুশী, সোনারচাঁদ জামাই, শালাশালীদের ওপর কি দরদ দেখতো! তাঁরা তখনো মনে করেছেন আমি খুকি আছি, ভগ্নীপতির কাছে আমার লজ্জা করবার যেন কিছু নেই; আর ভগ্নীপতি ছাড়া আমার রোগে সেবা করবার যেন আর কেউ নেই!

সেবারই সেরে ওঠার মুখে তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় একলা পেয়ে আমার দুর্বল দেহের প্রতিবন্ধকতা সত্বেও শুধু আমার চুম্বন করলেন না—আমার দেহের ওপর যে স্বাধীনতা নিলেন, সেটা সত্যিই আমার ভালো লাগেনি। মাকে গিয়ে খানিকটা রেখেঢেকে চুপি চুপি জামাইবাবুর বদমায়েসির কথা বল্‌লুম। মা রেগে উঠে বল্‌লেন, ইস্কুলে পড়ে তোরা বড্ড ফাজিল হয়ে গেছিস্, সুসি। নাটকনবেল পড়ে পড়ে তোদের মাথা গেছে বিগ্‌ড়ে। জামাইবাবুর তুই মেয়ের বইসী, ছেলেবেলা থেকে তোকে বড্ড ভালবাসে ও। সমানে ৩।৪ দিন ধরে সেবা করে এল তোর। একটু আদর করেছে—তার কি হয়েছে? সব তাতেই তোরা কু ভাবিস—না? যা যা, ওসব কথা মুখে আনিস্ না। দেবতার মত জামাই আমার!

"মার ওপর যেমন রাগ তেমনি অভিমান হ'ল আমার। আমি বদ্ আর জামাই হ'ল সাধু! আচ্ছা।...

"জামাইবাবু তাঁর নতুন বাসায় চলে গেলেন। কিন্তু প্রায় প্রতি শনিবারই আমাদের বাড়িতে তাঁর আর দিদির নেমন্তন্ন হত। এসেই শ্বশুর-শাশুড়িকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন, আর হগ্ মার্কেট থেকে কিনে আনা কেক-চকোলেট্ কিম্বা দ্বারিকের সন্দেশের বাক্স আমাদের তিন ভাইবোনকে উপহার দিতেন। একদিন একখানা মেট্রো শাড়ি, আর একদিন একজোড়া কানপাশা কিনে এনে আমায় উপহার দিলেন।

"পরীক্ষা তখন হয়ে গেছে। একদিন দিদি এলো না, জামাইবাবুর হাত দিয়ে মাকে চিঠি লিখে পাঠাল যে, তার শরীরটা একটু খারাপ, আমাকে যেন দিন পাঁচছয়েকের জন্যে পাঠিয়ে দেন্। আমি নানা ওজরআপত্তি কল্লুম, কিন্তু মা ধম্‌কে বল্লেন যেতে। বাবা বাড়ীর মোটর নিয়ে সন্ধ্যার পর কমিশন কত্তে বেরিয়ে গেছেন, ফিরতে রাত্তির হবে। রাত্তির দশটার সময় জামাইবাবুর আর আমার খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল। বাবা তখনও ফিরলেন না দেখে তিনি দারোয়ানকে ডেকে একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে নিলেন। আমরা দুজনে তাইতে চেপে রওনা হলুম। গাড়ি সেণ্ট্রাল এভেনিউ দিয়ে যখন দক্ষিণমুখো ছুট্‌তে লাগ্‌লো, তখন জামাইবাবু বললেন, সুসি, আজ তোকে একান্তভাবে নিজের কাছে পেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে এই দিনটির জন্যেই আমি এতকাল যেন দিন গুণছিলুম। বল্, এইবার তুই আমার হবি কিনা? বল্ আমায় ভালবাস্‌বি?...আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি আমার নানা অঙ্গ নিয়ে বিলসন কর্তে লাগ্‌লেন আর অনর্গল কানের কাছে প্রণয়-কূজন করে যেতে লাগ্‌লেন। ভালও লাগ্‌ছিল, বিরক্তি বোধও হয়েছিল। অত বড় একটা মানী জ্ঞানী চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের লোক আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে

পড়্‌তে চাচ্ছে, তার সামনে মাথা ঠিক রাখা আমার মত মেয়ের পক্ষে খুব কঠিন। মৃদুস্বরে বললুম, কেন দিদি তো রয়েচে, তাতে কি মন ওঠে না?

"খুব আন্তরিকতা গলার স্বরে এনে বল্‌লেন, তোমার দিদির সঙ্গে আমার মনের মিল কখনও হয় নি, হবেও না। বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি ওটি। ও শুধু গয়না, কাপড়চোপড়, ভাল খাওয়া ভালবাসে, আমাকে ভালবাসে না। তাই ওকে আমার হৃদয় ছাড়া সবই দিইছি। আর তোমার জন্যে, সুসি, হৃদয়টাকে এই ষোল বছর ধ'রে রিজার্ভ করে রেখে দিইছি। তুমিই সত্যিকারের আমার জন্ম-জন্মান্তরের বধূ। বল তুমি আমার হবে কি না? নইলে আমার সমস্ত জীবনটাই অভিশাপগ্রস্ত ব্যর্থ হবে, ইত্যাদি।...

"কি জবাব দিইছিলুম মনে নেই। কিন্তু এটুকু আজ মনের মণিকোঠায় জল্‌জল্ কচ্ছে—সেদিন গভীর রাত্রে দিদির পাশ থেকে উঠে প্রতীক্ষাশীল জামাইবাবুর অন্ধকার ঘরে পা টিপে টিপে এসেছিলুম। যেটুকু বাকি ছিল, তাও বিসর্জ্জন দিলুম। দিলুম—মায়ের ওপর অভিমান ক'রে, দিদির ওপর হিংসে ক'রে, কৈশোরে খুঁচিয়ে-জাগিয়ে-তোলা তাগিদের জোরে।

"কাকীমা, আপনার স্নেহ ও সমবেদনা এ জীবনে ভোলবার নয়, বোধ হয় পরজীবনেও ভুলতে পারব না। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই মায়ের চেয়েও আপনি আমার আপন, কারণ মা আমার যে দুঃখু বোঝেন নি—আপনি তা বুঝেছেন, মাকে যা ভরসা ক'রে বলতে পারিনি—আপনাকে তা বলতে পাচ্ছি।....

তারপর থেকে ভগ্নীপতি খুবই বাড়াবাড়ি করতে লাগ্‌লেন। এত বাড়াবাড়ি যে, দিদি স্পষ্ট বুঝতে পারল; বোধ হয় দু'একদিন

আমাদের অসঙ্গত আচরণ সে লক্ষ্যও করেছিল। তবুও স্বামীকে জোর ক'রে কিছু বল্‌তে পারেনি পাছে স্বামী রুষ্ট হ'য়ে তার খোরপোষ অলঙ্কার বন্ধ করেন। মাকেও সে প্রথমটা কিছু বল্ল না। বল্লে আমি বোধ হয় রক্ষে পেতুম, পাপের নেশা আমাকে এমন ক'রে পেয়ে বস্‌ত না। বাবা সদাশিব আর অতিব্যস্ত মানুষ, তিনি তো এত সব খবর রাখেনই না। জামাইবাবু এর পর নতুন মোটর কিন্‌লেন, শহরের দক্ষিণাংশে জমি কিনে বাড়ী তৈরি কত্তে লাগলেন। শনিবারে তিনি কোনদিন দিদিকে নিয়ে, কোনদিন দিদিকে না নিয়ে, আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন। এসেই আমার পড়ার ঘরে ইংরাজী পড়ানর নাম ক'রে ঢুকে, Short Stories কি Bible Selectionখানা তুলে নিয়ে দু' লাইন পড়িয়েই নানারকম হাসিঠাট্টা সুরু করতেন্। তাঁর অবুঝ শাশুড়ি অনেক সময় এসব লক্ষ্য করেও চুপ ক'রে থাক্‌তেন। দেবতা জামাই!

"আমার বউদি খুব চালাক মেয়ে, সে কনভেণ্টে থেকে লেখাপড়া শিখেছে, খুব নামজাদা অধ্যাপকের মেয়ে। তার ৪।৫ বছর বিয়ে হয়েছে, ছেলেপিলে হয়নি তখনও। কিছুদিন ধ'রে আমাদের কেলেঙ্কারি লক্ষ্য করেছিল সে। কাউকে কিছু বলেনি। দাদা তখন যুদ্ধের কাজে ফিরোজপুরে। একদিন জামাইবাবু আমার পড়ার ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন—বউদি তা দেখতে পেয়েছিল। সেইদিন সে আমায় চেপে ধর্‌ল। খানিকটা স্বীকার না ক'রে পারলুম না; বউদি খুব বক্‌ল আর সস্নেহে মিষ্টি উপদেশ দিল। কিন্তু তখন আমার দুটো পা কাদায় গাড়া, যে টেনে তুল্‌তে আস্‌বে সে-ও কাদায় পড়বে।

"বউদি বল্লেন যে, তাঁর ছোট মামা জামাইবাবুকে ভালরকমই চেনেন্, ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে বি, এ, পড়েছেন এক কলেজে এক হোস্টেলে থেকে। তিনি বলেছেন, ছাত্রাবস্থা থেকেই জামাইবাবুর স্বভাব খারাপ,

হোস্টেলের পাশের বাড়ীর এক মেয়েকে ভুলিয়ে বের ক'রে নিয়ে তিনি নাকি একবার আগ্রা পালিয়েছিলেন। তা'ছাড়া বেশ্যালয়েও যেতেন তিনি। যে সহোদর বড় ভাই জামাইবাবুকে বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়ে বড় বড় সাহেব-সুবোকে ধ'রে-ক'রে ওঁকে সরকারী চাকরিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই দাদার স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রীর ওপরও নাকি একবার বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে দাদার কানমলা খেয়েছিলেন উনি। আরও সব কত কি। বউদি আরও বললেন, জামাইবাবু একবার আমার মাস্‌তুতো বড় বোনের গায়ে হস্তার্পণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বউদি ওঁর সাম্‌নে অত্যন্ত সাবধানী ও গম্ভীর হয়ে থাকেন ব'লে জামাইবাবু এগুতে সাহস পান না; একটু ভয় করেন ওঁকে।

"এর পর কিছুদিন আমি জামাইবাবুকে এড়িয়ে চল্‌লুম। তাঁকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। সে বড় পাপী, আমিও ত ছোট পাপী। শয়তান আমায় সর্বনাশা আনন্দের স্বাদ দিয়েছে, তাকে ভোলা সহজ নয়। আর তাকে এড়াব কি, সে আমার পাছু ছাড়ে না। মা এততেও চেত্‌লেন না। এর পর দিদি আমাদের বাড়ীতে এল খালাস হ'তে। সে যখন আঁতুড়ে, জামাই-বাবু তখন ছেলে দেখ্‌তে এসে, আমাকে আর আমার ছ'সাত বছরের ছোট ভাইকে নিজের মোটরে চড়িয়ে সন্ধ্যার সময় বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমি যাব না—মা জোর ক'রে সাজিয়ে দিয়ে, যেতে বল্‌লেন। বায়োস্কোপ ভাঙ্‌লে, তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। সেখানে খাওয়াদাওয়া ক'রে আমি আর ছোট ভাই শুলুম দিদির ঘরে, আর জামাইবাবু শুলেন পাশের ঘরে। সে-ও একটা স্মরণীয় রাত্রি, পৈশাচিক লীলার চরম হ'ল নির্জ্জন কক্ষের নিঃশব্দ অন্ধকারে।

"জামাইবাবুকে কোর্টে পৌঁছে দিয়ে মোটর আমাদের দু'জনকে বাড়ী

ফিরিয়ে দিয়ে গেল। আগের রাত্রেই জামাইবাবু আমাদের বাড়ীতে টেলিফোন্ ক'রে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এসে দেখি সারা বাড়ীতে যেন একটা বিষণ্ণ উদ্বেগের ছায়া। রাত্রে বাড়ী ফিরিনি ব'লে মা আর দিদি দু'জনে সমস্বরে আমায় বক্‌তে লাগলেন। আমি অবাক হ'য়ে গেলুম; বল্‌লুম আমার কোন হাত ছিল না। বউদি আমায় তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে—হতচ্ছাড়ী, এত ব'লেও তোর মতিগতি ফেরাতে পাল্লুম না। ছিঃ ছিঃ, একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না দেখ্‌ছি তুই। কাল সারারাত তোর দিদি আঁতুড়-ঘরে জেগে বসে কাটিয়েছে আর কেঁদেছে তুই ফিরিস্‌নি ব'লে। মার কাছে সব ব্যাপার খুলে বলেছে। আরও বল্লে, আমি ম্যাট্রিক পাশ করিনি—কলেজে পড়িনি ব'লে আমাকে এত হেনস্থা করে তোমার জামাই। আমারই চোখের সাম্‌নে কিনা আমার ছোট বোনকে নিয়ে—। আমায় বিষ দাও মা, খেয়ে এমন স্বামীর হাত থেকে রেহাই পাই। আজ ষোল-সতের বছর তিলে তিলে জলছি। পাছে তোমরা মনে কষ্ট পাও ব'লে বিশেষ কিছু বলিনি এতদিন।....

"এর দেড় মাস পরে বোঝা গেল পাপের কুফল আমার দেহের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। মাবাবার আহার গেল, নিদ্রা গেল। আমার কি অবস্থা, তা—কাকীমা, আপনাকে ব'লে বোঝাতে পারব না। শেষের দিকটা যেন কেমন বেপরোয়া বা উদাসীন হয়ে পড়লুম; খুব অনুতাপও হ'ল না, আবার বাঁচতেও সাধ হ'ল না। বাবা কোথা থেকে একটা ওষুধ যোগাড় ক'রে আনলেন। তিন মাসের মাঝামাঝি ক্রমাগত পায়খানা করতে করতে প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায় প্রবল রক্ত-স্রোতের সঙ্গে পেটের গরল বেরিয়ে এল।

"মা পারতপক্ষে আমার সঙ্গে কথা বলেন না। বাবা কিন্তু আমার সঙ্গে আগেকার মতই স্নেহমাখা সদয় ব্যবহার করতে লাগলেন।

জামাইবাবু এ সবের কিছুই জান্‌লেন না, তাঁকে জান্‌তে দেওয়া হল না।

"দিন কয়েক শয্যার আশ্রয়ে থেকে উঠে বস্‌লুম এবং পড়াশুনায় মন বসাবার চেষ্টা করলুম। এই সময় ঘটকঘটকীরা বাড়ীতে খুব আসা-যাওয়া কর্‌তে লাগল। মেয়ে-দেখানর ও পাত্র দেখার জোর পালা পড়ল। জামাইবাবু যে পাত্রটি দেখে শেষ সম্মতি দিলেন, তার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেল।

"যার সঙ্গে বিয়ে হল তাকে ভালবাস্‌তে পারলুম কি? তখন পারিনি বটে, আজ রোগশয্যায়—মৃত্যুর পাশাপাশি শুয়ে মনে হয়—বাস্‌তে সুরু করেছি। তখন সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল ওই সরল আপনভোলা কর্ম্মবীর বন্ধুবৎসল যুবকটির ওপর। কেন জানেন? কেন ও না জেনেশুনে আমাকে ওর বধূ ব'লে গ্রহণ কল্ল? কেন আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে ওর আত্মীয়রা এত উৎসব আর সমাদর কল্ল? কেন ও আমার উচ্ছিষ্ট দেহটাকে ভোগ করবার জন্যে ষোড়শোপচারে পূজো সুরু ক'রে দিল? আমি ছ'মাস ওকে শয্যার ভাগ দিয়েছিলুম, কিন্তু দেহের ভাগ দিই নি। মূল্যহীনকে ওর কাছে অমূল্য কর্ত্তে চেয়েছিলুম। এক একদিন ওকে যা মুখে আসে তাই বলে গালগাল দিয়েছি, কোনদিন ওর চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করেছি, কোনদিন এক-একটা আজগুবি রকমের ফরমাস করেছি। সমস্ত ও মুখ বুঁজে বরদাস্ত করেছে—মেনে নিয়েছে।

"সহিষ্ণুতার অবতার ও, ওকে আমি প্রাণ ভ'রে নমস্কার করি। ওর পায়ের একটা লাথিতে কাদা হয়ে যেতুম আমি। কিন্তু কই, একটা আঙুল দিয়ে কখনও টোক্কা মারেনি—পাছে ব্যথা পাই আমি। জোরের অধিকার ভগবান ওকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে অধিকারের আস্ফালন ও কোনদিন করেনি আমার সামনে। ওরা

বাবার চেয়ে বড়লোক, ও নিজে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েছে, ওর একটা বোন্ লরেটোয় সিনিয়র কেম্ব্রিজ পড়ে। জামাইবাবুর চেয়ে দেখতে ও একটু নিরেস বটে, কিন্তু গুণে ও তাঁর কত ওপরে। বহু গরীব বন্ধুকে পাড়াপ্রতিবেশীকে অর্থসাহায্য করে, গরীবের ছেলেকে বই কিনে দেয়, পরীক্ষার ফী যোগায়, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিলোয়, রাত জেগে বস্তির রোগীদের সেবা করে। কলেজে পড়্‌তে পড়্‌তে ঘুষ-আদায়কারী এক পাহারওয়ালাকে ঠেঙিয়ে একমাস জেলে গিয়েছিল। তাইতে ওকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হবার ফাঁকে ফাঁকে ঘৃণা কর্‌তে ইচ্ছে ক'রে খুব বেশী ক'রে। শেষটা কিনা আমায় বিয়ে করল!

"আরও রাগ হ'ল ওর ওপর সেদিন—যেদিন দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন জামাইবাবুর অনুরোধে ও একরাত্রির জন্যে ভাল-মানুষেতা ক'রে রেখে এল আমাকে তাঁর বাড়ীতে। খেটেখুটে দিদি ঘুমিয়ে পড়তেই ঘুমন্ত শয়তান উঠ্‌ল জেগে। পরের পত্নী ব'লে অনেক অনুনয় বিনয় কর্লুম, শুন্‌ল না কিছুতেই। সমুদ্রের ডাক ভুলে খিড়কির পচা ডোবায় আবার একটা ডুব দিয়ে শামুক তুলে আনলুম। পাপের ভরা পরিপূর্ণ হ'ল। এ সব স্বীকার করতে আজ আর লজ্জা নেই কাকীমা।

"এর পর থেকে জামাইবাবুকে জোর ক'রে এড়িয়ে চল্‌লুম এবং স্বামীকে একদিন স্পষ্টই বললুম—উনি লোক ভাল নন্। ভোলানাথ আমার ভালমন্দর স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্যে একটা প্রশ্নও কল্লেন না। আশা জাগ্‌ল হয়তো জীবনের ভুল ভুলে সুখে ঘর করতে পারব, সমুদ্রের অতলে ডুবে মাণিক তুলতে পারব, কিন্তু পাল্লুম কই!....

"প্রায় মাস দশেক পরে একটি মেয়ে হ'ল। তিন দিন পরে দেহের দুর্ব্বলতা আর ঘুমের ঘোর কেটে গেলে, মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌লুম। য়্যাঁ, এর মুখচোখ যে অনেকটা জামাইবাবুর মত!

দিদির ছোট মেয়ে লুসির সঙ্গে এর শুধু বয়েস আর রঙের একটু তফাৎ। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! এখনি যে ওরা বুঝতে পারবে, এখনি যে স্বামী ধ'রে ফেল্‌বে। হয়তো বুঝেছিল সবাই, কিছু বলেনি। হয়তো বা আমার মতো খরদৃষ্টি কারু নয়। হয়তো সত্যি অতটা মিল নেই।

"কিন্তু আমি ভয়ে কেবলই শিউরে উঠ্‌তে লাগলুম। মেয়েটাকে পেট ভ'রে মাই দিতেও আমার মন চাইত না। ও পেট থেকে মরা পড়্‌লে অথবা হয়ে মরে গেলে তো কেলেঙ্কারি এমন স্পষ্ট ও পীড়াদায়ক হ'ত না। শেষটা কি মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে আমি বিষ খাব? আঁতুড়ে আমার খাওয়া গেল, ঘুম গেল, ভাবনায় ভাবনায় আমি জর্জ্জরিত হয়ে রইলুম। হঠাৎ একটা নতুন ভাবনা এসে জুট্‌ল;—আর কেউ ধর্‌তে না পারুক, দিদি নিশ্চয়ই ধরতে পারবে। তখন আর রক্ষে নেই, আমাকেও খুন করবে, মেয়েটাকেও খুন করবে। এই ভেবে মেয়েটাকে দিনরাত বুকে ক'রে রাখ্‌তুম। এক এক সময় থর্‌-থর ক'রে কাঁপি আর হাউ হাউ ক'রে কাঁদি, কথা কারো সঙ্গে বিশেষ বলি না।

"কবিরাজ এসে বল্‌লেন—মাথার দোষ; প্রসবের পর কারো কারো হয়। নাইতে-খেতে সেরে যাবে। ওষুধ দিয়ে গেলেন। দু'মাস ওষুধ খেয়ে মাথার দোষ সার্‌ল, ভয় কাট্‌ল, কিন্তু শরীর পাকাতে লাগ্‌ল, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ে। কবিরাজ সূতিকা বল্লেন। কিন্তু ডাক্তার এসে মাথা নাড়্‌লেন এবং এক্সরে নিতে বল্লেন। শাশুড়ী খুকিকে নিয়ে কল্‌কাতায় থাক্‌লেন, খুড়্‌শ্বশুর আর খুড়শাশুড়ী আমায় নিয়ে মধুপুর এসেছেন। বাঁচ্‌ব না জানি, বাঁচ্‌তে সাধ নেই। কিন্তু কপালে কতদিন ভোগ আছে কে জানে?

* * * * *

কাকীমা গো, কী যে আনন্দ হচ্ছে দেখে আপনাকে। আমার আর বেশী দিন নেই। তিনটে অনুরোধ আপনাকে ক'রে যাচ্ছি—পারেন ত রাখ্‌তে চেষ্টা করবেন। আমার যে ফটোখানা দিয়েছি—বাঁধিয়ে টানিয়ে রাখ্‌বেন আপনার ঘরের দেওয়ালে।...মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খুকিকে আমার শাশুড়ির কাছে পাঠিয়ে দেওয়াবেন; নইলে ও দ্বিতীয়-সুস্মিতা হয়ে গ'ড়ে উঠ্‌বে।...আর, ও (স্বামী) আজ হোক কাল হোক্‌ বিয়ে করবেই জানি। কিন্তু পারেন যদি—ঘটকীকে দিয়ে ওর জন্যে একটি অল্পবইসী অল্পশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যোগাড় করিয়ে দেবেন, যার মাথার ওপর কোন বোন-ভগ্নীপতি নেই।....

আর হয়তো দেখা হবে না কাকীমা। পিদিম্‌ নিব্‌ল ব'লে। নমস্কার, প্রণাম।

ষষ্ঠ আলোচনা

সহবাসী ও প্রতিবেশী

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভারতের সকল শহরে অতিরিক্ত লোক সমাগম সুরু হইয়াছে এবং বড় বড় সহরের উপকণ্ঠে বা নিকটে বড় বড় শহরতলী ও ছোট ছোট উপশহর গড়িয়া উঠিতেছে। শহরগুলির সংখ্যা, কলেবর ও উহাদের লোকসংখ্যা কি কি কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে, তাহা ব্যক্ত ও বিবেচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু বলা যায় যে, লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যতই বাড়িতেছে, পল্লীর প্রতি মোহ তাহাদের ততই কমিতেছে। Industrial Revolutionয়ের ফলে লোকের চাষ-আবাদের প্রতি একদিকে যেমন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ শহরে আসিয়া বসবাস করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে। তদুপরি বৃটিশ শাসনের মহিমায় পল্লীগুলি বৈজ্ঞানিক যুগের সর্ব-প্রকার কৃষ্টি ও অভ্যুদয়ের চিহ্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দলাদলি ও দৈন্যের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। ভাগ্যান্বেষণে, উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য, আরাম ও বিষয়-লাভাশায় তাই লক্ষ লক্ষ লোক শহরগুলিতে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে।

কলিকাতায় ভিড় ও তাহার কুফল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটা সময়ে শহরগুলিতে লোকসংখ্যা দেড় গুণ হইতে দ্বিগুণ হইয়াছিল। গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে ভারত-বাটোয়ারার পর হইতে পশ্চিম-বাংলা এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের সমস্ত শহর-গুলিরই লোকসংখ্যা বোধহয় দ্বিগুণ হইয়াছে, লোকবিরল পল্লীগুলিও বাস্তুত্যাগীদের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে। কলিকাতা অধুনা সর্বাপেক্ষা

গুরুজনতা-ভারে ক্লিষ্ট। গত ১৯৪১ সালের আদমসুমারে কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ ছিল, মহাযুদ্ধের শেষাশেষি কালে উহা ত্রিশ লক্ষে আসিয়া উঠিয়াছিল। গত বৎসর কলিকাতা হইতে খুব কম করিয়া তিন লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে। কোটালের বানের ন্যায় ক্রমশ জনস্রোত বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ইহার ফলে হাজার নূতন সমস্যা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধোৎপন্ন কালাবাজারের উৎপাত ও আধিপত্য যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন এখানকার বাড়িওয়ালারা আফ্‌শোষে হাত কামড়াইয়াছিল—আর পাঁচ জনের মতো তাহারা টাকা কামাইতে পারে নাই। গতবৎসর হইতে ঈশ্বর তাহাদিগের সকল পরিতাপ মুছিয়া দিয়াছেন। তাহারা এক হাতে মোটা সেলামি ও অন্য হাতে চতুর্গুণ ভাড়া আদায় করিতেছে। একখানি আলোবায়ুবর্জিত স্যাতস্যেঁতে চোর-কুঠুরির জন্য তাহারা সেলামি হাঁকে ও পায় পাঁচশত হইতে হাজার এবং ভাড়া পঞ্চাশ হইতে চল্লিশ। পূর্ববঙ্গের হিন্দু গৃহ-ত্যাগিগণ কোনমতে আশ্রয়লাভের আতঙ্ককর আগ্রহে অধীর হইয়া, তাহাদের যথাসর্বস্ব পণ করিয়া, যাহার মাথায় আচ্ছাদন দেখিয়াছে, তাহার তলায়ই পোঁটলা-পুঁটলি ও পরিবার আনিয়া স্থাপন করিয়াছে। অনেকে গাছতলাও সার করিয়াছে, ভাঙাফুটা টিনের বা গোল-পাতার ছাপরা বাঁধিয়া লইয়াছে, হাজারে হাজারে সরকারী রেফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় লইয়াছে। পিতৃপিতামহের ভিটা ও বাঁধা রোজগার ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিয়া যাহারা যেখানে পারে সেইখানে আসিয়া গুড়ের নাগরির ন্যায় ঠাসাঠাসি করিয়া বাস করে, তাহারা স্বাস্থ্যনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি কোন নীতিই মানিয়া

চলিতে পারে না ; বেদিয়াদের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধনহীন বেপরোয়া জীবনের ছোঁয়াচ্ আসিয়া যেন তাহাদের গায়ে লাগে।

পশ্চিম বঙ্গে নবাগত বাস্তুত্যাগী স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দুর্নীতি ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে ; তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের আপাতত সাধ্যায়ত্ত নহে। এ দুর্নীতিকে আমরা কিছুকাল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত আছি। ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক ছেলে-মেয়েগুলিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না, অরক্ষণীয়া কন্যা-দিগকে পাত্রস্থ করিতে পারিতেছেন না, পত্নীর গৃহধর্মপালনের কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মনের মধ্যে পুরুষানু-ক্রমে যে বিশ্বাস ও সংস্কার শিকড় গাড়িয়া ছিল, অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িক বিপ্লবের বন্যা আসিয়া সেগুলিকে শ্লথ ও নিস্তেজ করিয়া দিয়াছে।

তাঁহারা এখন শত অসুবিধা ও অসম্মানের মধ্যে কোনমতে টিকিয়া থাকিয়া, আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তনের স্বপ্ন-নীহারিকায় সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহাদের কন্যাদিগকে প্রতিবেশী বদমায়েসরা ষড়যন্ত্র করিয়া কুপথে লইয়া যাইতেছে, ছদ্মবেশী কুট্টনীরা ধনী যুবকের সহিত বিবাহ দিবার অছিলা করিয়া তাহাদিগকে বেশ্যালয়ে আনিয়া উঠাইতেছে, সেখান হইতে তাহাদিগকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের নানা স্থানের আড়কাঠি-দের হস্তে বিক্রয় করিয়া ফেলা হইতেছে। কোথাও পিতা, মাতা, খুড়া, খুড়ি বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা বিনাপণে কোন ভদ্রবেশী বদমায়েসের সহিত কন্যাদের নমোনমঃ করিয়া বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন, তাহাদের পরিণাম ভাবিয়া দেখিতেছেন না। কোথাও আত্মীয় বা আত্মীয়ারা অর্থ ও সাচ্ছল্যের আশায় প্রচ্ছন্ন ও অর্ধপ্রকাশ্য-ভাবে কুমারীদের ও তরুণী বিধবাদের দেহগুলিকে রূপের হাটে আনিয়া ব্যবসাপাটে তুলিয়া ধরিতেছেন। লজ্জা, সঙ্কোচ ও শঙ্কা কোনটাকেই ইঁহারা মনের কোণে যেন ঠাঁই দিতে চাহিতেছেন না। রতিজ ব্যাধি,

অবৈধ গর্ভ ও তথাকথিত গৃহত্যাগ নবাগতদের মধ্যে দিন দিন ভয়াবহ-ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা আমাদের সমাজ-পতি ও রাজপুরুষদের নিকট গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিবে।

মিনতির বিড়ম্বনা

এই-সেদিন একটি মেয়ের কাকা আমার নিকট পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন ; অবশ্য তাঁহাকে গভীর সহানুভূতি জানানো ছাড়া অন্য কোনরূপ সাহায্য দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। ভদ্রলোকটি উচ্চ-শিক্ষিত ও গাণিতিক গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। মেয়েটি তাঁহার মামাতো ভাইয়ের কন্যা। বয়স আন্দাজ ১৭, দুই বৎসর যাবৎ বাধ্যতাজনিত পড়া বন্ধ রাখার পর এই বৎসর হইতে দক্ষিণ-কলিকাতার কোন বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেছে। ইহারা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক্ হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছে। ইহার পিতা পূর্ব হইতেই কোন মেসে থাকিয়া এখানকার কোন অফিসে অল্পস্বল্প মাহিনায় চাকুরি করেন, প্রায়ই তাঁহাকে কার্যোপলক্ষে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

নোয়াখালির নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর এই ভদ্রলোক বহুকষ্টে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে কয়েক দল নরপিশাচের খরদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। আসিয়া কিছুদিন এখানকার সেবা-সমিতির আশ্রয়ে থাকিয়া, বহু কষ্টে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া সপরিবারে থাকিবার ঠাঁই করিয়া লন্। যে পাড়ায় ঘর ভাড়া করা হইল, সেই পাড়ায় একটি যুবক তাহার এক কাকার বাসায় থাকিয়া চাকুরি করিত। যুবকটি পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের পাশের গ্রামের ছেলে ; পূর্ব হইতেই তাহার সহিত ইঁহার অল্পস্বল্প পরিচয় ছিল। সেই যুবকটিই তাঁহাদের সহিত পূর্বের অস্পষ্ট পরিচয় গায়ে পড়িয়া ঝালাইয়া

লইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া একখানি অল্প ভাড়ার ঘর তাঁহাদিগকে যোগাড় করিয়া দেয়। ভদ্রলোকটি ও তাঁহার স্ত্রী যুবককে তাহার এই অযাচিত উপকারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। ভদ্রলোকটির নাম রাখা গেল—কালীচরণ বাবু ও যুবকটির নাম—মোহনলাল।

ইহার পর যবকটি এই পরিবারে সময়ে অসময়ে আসা-যাওয়া সুরু করিয়া দিল এবং তাঁহাদের ছোটখাটো উপকার ও ফাই-ফরমাস পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিল। কালীবাবুকে সে 'কাকাবাবু' ও তাহার স্ত্রীকে 'কাকীমা' সম্বোধন করে। সে-ই মিনতি নাম্নী তাঁহাদের কিশোরী কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া স্থানীয় একটি মেয়ে-স্কুলে অর্ধ-মাহিনায় ভর্তি করাইয়া দিল। ইহাদের রেশন-কার্ডগুলি সে-ই তাড়াতাড়ি আফিস হইতে তদ্বির করিয়া বাহির করিয়া দিল। কলিকাতায় নবাগতা নূতন সম্পর্কের কাকীমা ও তাঁহার ছেলেমেয়েগুলিকে মোহন মাঝে মাঝে ট্রামে-বাসে চড়াইয়া এখানে-ওখানে বেড়াইতে লইয়া যায়। মাঝে মাঝে সে ইহাদের বাসায় আসিয়া চা-পান করে, জলযোগ করে; কখনো নিমন্ত্রিত হয়। মাস ছয়েকের মধ্যে সে একেবারে ইহাদের বাড়ির ছেলের মতো হইয়া গেল।

মোহনলাল দেখিতে সুরূপ ও সুগঠিত। গোঁফ-দাড়ি রোজ কামায়। বয়স তাহার ধরিবার উপায় নাই—পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে; যে-কোন বয়সের সহিত সে খাপ খায়। কোটপ্যাণ্ট্ পরিয়া আফিসে যায়; কিন্তু নিজের বাড়িতে ও সভাসমিতিতে সর্বদা খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর ব্যবহার করে। পান-সিগারেট সে খায় না, বায়োস্কোপ দেখে, কিন্তু থিএটারকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যোগে-যাগে সে পাড়ার ভলাণ্টিয়ার-দলের একজন সর্দার হয়। বারোয়ারী দুর্গা-পূজারও সে একজন জবরদস্ত পাণ্ডা। চাঁদা সাধিবার সময় সে

গান্ধীটুপি মাথায় দিয়া বিনয়ের অবতার হয়। দাঙ্গার সময় সে কোমরে ছোরা ও হাতে লোহার ডাণ্ডা লইয়া রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়াছে।

মোহন বলে, সে বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছে, কিন্তু আসলে ম্যাট্রিক-পাস। মিনতিকে সে সন্ধ্যার পর প্রায় নিত্য আসিয়া পড়া বলিয়া দেয়। কয়েক মাস পরে নূতন কাকীমা হঠাৎ মোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার বিবাহ হইয়াছে কিনা। সে সজোরে ঘাড় নাড়িয়া সগর্বে উত্তর দেয়—না। পাঁচ বৎসর পূর্বে সে পঁচাত্তর টাকা মাহিনায় চাকরি করিতে ঢুকিয়া আপাতত দেড়শত পাইতেছে, শীঘ্রই সে ২০০৲ মাহিনায় একটা সেক্সন্-ইন-চার্জ হইবে। যতদিন সে ৩০০৲ রোজগার করিতে না পারিবে, ততদিন সে বিবাহ করিবে না। আর তাহা ছাড়া, বিবাহ করিবার ইচ্ছাও তাহার বিশেষ নাই।

নূতন কাকীমা একদিন পুরাতন কাকীমার বাসায় বেড়াইতে গিয়া মিনতির সহিত তাঁহার ভাশুরপুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি কতকটা রাজী হইলেন বটে, কিন্তু পাত্র রাজী হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। মিনতির পিতা কালীচরণ-বাবু একদিন স্ত্রীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কথাটা মোহনের নিকট পাড়িলেন। সে অকপটভাবে উত্তর দিল যে, ছয় মাসের মধ্যে তাহার ২০০৲র মাহিনা হইবে, তখন বরং সে বিবাহের কথা ভাবিয়া দেখিবে। তদুপরি মিনতি তাহার ছোট বোনের মতো, তাহার সহিত—ছিঃ।....

শুনিয়া কালীবাবু ও কালীজায়া মনে মনে মহাখুশী। বাঃ, কী সুন্দর স্বভাব! জামাই করিবার উপযুক্ত ছেলে বটে।

মোহন কিছুদিন পরে মিনতিকে ৮০৲ খরচ করিয়া একটি হার্মোনিয়ম্ কিনিয়া দিল এবং তাহাকে ভৈরবী, ভূপালী ও ইমনে সা-রে-গা-মা সাধা শিখাইতে লাগিল। তারপর, তাহাকে শনি ও

মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ট্রামে করিয়া একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য লইয়া যাইতে এবং দুইঘণ্টা পরে নিজে সঙ্গে করিয়া ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। কোন রবিবারে নূতন কাকীমা ও মিনতিকে ছাড়া তাঁহার অন্য ছেলেমেয়েগুলিকে সে বায়োস্কোপ দেখাইতে লইয়া যাইত, আর এক রবিবারে সে একা মিনতিকে লইয়া যাইত। পিতামাতা ইহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। আর দু'দিন পরে তো সে জামাই-ই হইবে, মনের মতো করিয়া নিজের স্ত্রীকে গড়িয়া লয় যদি—তাহাতে আর আপত্তি কি!

এমনিভাবে দিন যায়। গত ৬ই সেপ্টেম্বর মিনতি চুপি চুপি তাহার মাতাকে বলিল যে, তিন-চারি দিন পূর্বে তাহার মাসিক স্রাবের সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মাতা 'ও কিছু না' বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। পুনরায় তিনচারি দিন পরে মিনতি শুষ্ক শঙ্কিত-বদনে মায়ের নিকট আসিয়া তাহার পূর্বোক্ত অসুবিধার কথা জানাইল। এবার তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, 'তোর তো ও রকম মাঝে-মাঝে হয়।' মিনতি বলিল, 'আট দিন দেরি কখনো হয় না, মা। আর, একটু ভয় করবার কারণও ঘটেছে।' তারপর সে মায়ের নিকট নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিল যে, গত তিন মাস কাল প্রায় প্রতি রবিবারেই সে ফিরিবার পথে মোহনলালের ঘরে গিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছে।...

মাতার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি মেয়েকে রাগের মাথায় গুটি কয়েক চড় কষাইয়া দিলেন।

দুইদিন পরে বহির্ভ্রমণ হইতে কালীচরণ বাবু বাসায় ফিরিলে তাঁহার স্ত্রী তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বিপদের কথা সমস্ত বিবৃত করিলেন। কালীবাবু তৎক্ষণাৎ স্খলিতপদে মোহনের বাসার দিকে ছুটিলেন। সেখানে আসিয়া শুনেন যে, আফিসের কাজে সে গত-

রাত্রে তেজপুর গিয়াছে। আফিসে খোঁজ লইয়া জানা গেল একমাস পূর্বে ক্যাশ হইতে টাকা সরাইয়া অভিযোগে তাহার চাকরি গিয়াছে। সেখানে সে মাগ্‌গি-ভাতা সমেত ৮০৲ মাহিনায় রোকড় লেখার কেরানি ছিল। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। সে তাসের জুয়া খেলে ও মদ খায়। রাজসাহীর দিকে কোন গ্রামে তাহার বধূ চারি বৎসর কাল পিত্রালয়ে স্বামিপরিত্যক্তা হইয়া পড়িয়া আছে। উত্তর কলিকাতার কোন মেসে থাকিবার সময় ঠিক অনুরূপভাবে পাশের বাড়ির একটি ভিন্নজাতীয়া কুমারীর সর্বনাশ করিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল এই গুণধরটি!...

এতো গেল নবাগতদের কথা।...কিন্তু যাহারা কলিকাতার স্থায়ী বা পুরাতন বাসিন্দা, যাহারা কলিকাতায় বহুকাল বা কিছুকাল ধরিয়া সপরিবারে নিজের অথবা ভাড়া-করা বাড়িতে বাস করিতেছে, তাহাদের কথা কিছু বলি! কলিকাতা শহরের এলাকায় সর্ব আকার-প্রকারের একলক্ষ গৃহে ও ত্রিশহাজার বস্তির কুঁড়ে ঘরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বাস করে। বড় জোর এক হাজার বাড়িতে ঠাসাঠাসি কম, বাকি বাড়িগুলিতে ভিড়ের অবধি নাই। কোন কোন ঘরে একএকটি লোক—কবরে শুইবার যতখানি জায়গা একটি শবকে দেওয়া হয়, ততখানিও পায় না। লক্ষাধিক লোক এখানে বৎসরের অধিকাংশ কাল ফুটপাথে ও গাড়ি বারান্দার নীচে, বাড়ির রোয়াকে শয়ন করে। এখন পুরাতন ও নূতন অধিবাসীদের মধ্যে অনেক পাড়ায় ও অনেক বাড়িতে মেশামিশি হইয়া গিয়াছে; নদীর জলের সহিত বন্যার জল আসিয়া মিশিয়াছে। বাংলার সকল জেলার সকল অঞ্চলের ভাষাভঙ্গিমা, আচার, অনাচার, রীতিনীতি, গতিপ্রকৃতির প্রবল সংঘাত, সমন্বয় ও সংমিশ্রণ সুরু হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের কলিকাতায় অন্তত একখানি নিজস্ব বাড়ি আছে,

মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ট্রামে করিয়া একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য লইয়া যাইতে এবং দুইঘণ্টা পরে নিজে সঙ্গে করিয়া ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। কোন রবিবারে নূতন কাকীমা ও মিনতিকে ছাড়া তাঁহার অন্য ছেলেমেয়েগুলিকে সে বায়োস্কোপ দেখাইতে লইয়া যাইত, আর এক রবিবারে সে একা মিনতিকে লইয়া যাইত। পিতামাতা ইহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। আর দু'দিন পরে তো সে জামাই-ই হইবে, মনের মতো করিয়া নিজের স্ত্রীকে গড়িয়া লয় যদি—তাহাতে আর আপত্তি কি!

এমনিভাবে দিন যায়। গত ৬ই সেপ্টেম্বর মিনতি চুপি চুপি তাহার মাতাকে বলিল যে, তিন-চারি দিন পূর্বে তাহার মাসিক স্রাবের সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মাতা 'ও কিছু না' বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। পুনরায় তিনচারি দিন পরে মিনতি শুষ্ক শঙ্কিত-বদনে মায়ের নিকট আসিয়া তাহার পূর্বোক্ত অসুবিধার কথা জানাইল। এবার তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, 'তোর তো ও রকম মাঝে-মাঝে হয়।' মিনতি বলিল, 'আট দিন দেরি কখনো হয় না, মা। আর, একটু ভয় করবার কারণও ঘটেছে।' তারপর সে মায়ের নিকট নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিল যে, গত তিন মাস কাল প্রায় প্রতি রবিবারেই সে ফিরিবার পথে মোহনলালের ঘরে গিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছে।...

মাতার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি মেয়েকে রাগের মাথায় গুটি কয়েক চড় কষাইয়া দিলেন।

দুইদিন পরে বহির্ভ্রমণ হইতে কালীচরণ বাবু বাসায় ফিরিলে তাঁহার স্ত্রী তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বিপদের কথা সমস্ত বিবৃত করিলেন। কালীবাবু তৎক্ষণাৎ স্খলিতপদে মোহনের বাসার দিকে ছুটিলেন। সেখানে আসিয়া শুনেন যে, আফিসের কাজে সে গত-

রাত্রে তেজপুর গিয়াছে। আফিসে খোঁজ লইয়া জানা গেল একমাস পূর্বে ক্যাশ হইতে টাকা সরাইয়া অভিযোগে তাহার চাকরি গিয়াছে। সেখানে সে মাগ্‌গি-ভাতা সমেত ৮০৲ মাহিনায় রোকড় লেখার কেরানি ছিল। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। সে তাসের জুয়া খেলে ও মদ খায়। রাজসাহীর দিকে কোন গ্রামে তাহার বধূ চারি বৎসর কাল পিত্রালয়ে স্বামিপরিত্যক্তা হইয়া পড়িয়া আছে। উত্তর কলিকাতার কোন মেসে থাকিবার সময় ঠিক অনুরূপভাবে পাশের বাড়ির একটি ভিন্নজাতীয়া কুমারীর সর্বনাশ করিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল এই গুণধরটি!...

এতো গেল নবাগতদের কথা।...কিন্তু যাহারা কলিকাতার স্থায়ী বা পুরাতন বাসিন্দা, যাহারা কলিকাতায় বহুকাল বা কিছুকাল ধরিয়া সপরিবারে নিজের অথবা ভাড়া-করা বাড়িতে বাস করিতেছে, তাহাদের কথা কিছু বলি! কলিকাতা শহরের এলাকায় সর্ব আকার-প্রকারের একলক্ষ গৃহে ও ত্রিশহাজার বস্তির কুঁড়ে ঘরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বাস করে। বড় জোর এক হাজার বাড়িতে ঠাসাঠাসি কম, বাকি বাড়িগুলিতে ভিড়ের অবধি নাই। কোন কোন ঘরে একএকটি লোক—কবরে শুইবার যতখানি জায়গা একটি শবকে দেওয়া হয়, ততখানিও পায় না। লক্ষাধিক লোক এখানে বৎসরের অধিকাংশ কাল ফুটপাথে ও গাড়ি বারান্দার নীচে, বাড়ির রোয়াকে শয়ন করে। এখন পুরাতন ও নূতন অধিবাসীদের মধ্যে অনেক পাড়ায় ও অনেক বাড়িতে মেশামিশি হইয়া গিয়াছে; নদীর জলের সহিত বন্যার জল আসিয়া মিশিয়াছে। বাংলার সকল জেলার সকল অঞ্চলের ভাষাভঙ্গিমা, আচার, অনাচার, রীতিনীতি, গতিপ্রকৃতির প্রবল সংঘাত, সমন্বয় ও সংমিশ্রণ সুরু হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের কলিকাতায় অন্তত একখানি নিজস্ব বাড়ি আছে,

তাহারাও অনেকে সম্প্রতি হয় পয়সার লোভে নতুবা অনুরোধের চাপে পড়িয়া নিজেদের ব্যবহার্য কক্ষগুলির এক বা একাধিক কক্ষ অথবা গৃহের একাংশ ভাড়া দিয়াছে। গত দুই বৎসরের মধ্যে অনেক খোলা বারান্দা ঢাকা বারান্দায় বা উপকক্ষে, অনেক গোয়াল, বাথরুম ও জঞ্জাল রাখিবার কুঠুরি কোনমতে মাথা গুঁজিবার ঘরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ অপরিচিত লোকের ঠাসাঠাসি ও স্ত্রীপুরুষে মেশামিশির ফলে নীতিনিষ্ঠা ও শালীনতা রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃতপ্রায় হইবে—ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। এক জলের কল, এক গোসলখানা, এক চৌবাচ্চা, এক সিঁড়ি, এক ছাদ, এক বারান্দা, এক উঠান দশটি-বিশটি ভাড়াটিয়া পরিবার হয়তো একসঙ্গে ব্যবহার করে। চতুর্দিকে অশ্রান্ত কলরব, কর্কশ ভাষণ, তম্বি, তাগাদা, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, ছায়াচ্ছন্নতা, জীর্ণতা, অভাব, নির্লজ্জতা, ব্যস্ততা, বিস্রস্ততা, সঙ্গীত ও ইঙ্গিত। শত আশা, ভরসা, রুচি, অভিরুচি, ভাবনা ও উদ্দেশ্যের ঠোকাঠুকি ও জড়াজড়ি! ইহার মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও সুনীতিতত্ত্বের সূচ ফুটাইতে যাওয়া মূর্খতা।

তখন আর এখন

কিন্তু সাম্প্রতিক আব্‌হাওয়া লইয়াই শুধু আমাদের আলোচনা নয়। পাঁচ, সাত, দশ, পনেরো বৎসর পূর্বেকার কলিকাতার অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ, ইদানীন্তন কালের সমস্যানির্মুক্ত, পরিবেশের কথাও ধরিতেছি। তখন মেয়েদের আব্‌রু ও গতিবিধির সংকীর্ণতা একটু বেশী ছিল; বিদেশী সভ্যতার সুফল ও কুফল ধনী ও শিক্ষিতের সহিত সমানে ভাগ করিয়া খাইবার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীপুরুষরা এত মাতামাতি আরম্ভ করে নাই। পনেরো-বিশ কেন, পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার নাগরিক জীবনে প্রচুর দুর্নীতির

আধিপত্য ছিল—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তৎকালে এবং তাহারো পূর্বে মানুষের দুর্জয় পশুপ্রবৃত্তির প্রসাদন করিবার এক একটা নির্দিষ্ট শৈলী, স্থান, কাল ও পাত্র ছিল; তাহার দমন ও প্রশমন করিবারও মৃদু ও কঠোর ব্যবস্থা ছিল। তখন লোকলজ্জা ছিল, ভয় ছিল, গোপনতার প্রয়াস ছিল; আর সচ্চরিত্রতার সহিত সম্ভ্রম, লোকপ্রিয়তা ও অন্নসংস্থানের একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল। প্রায় প্রতি পাড়ায়ই এমন একদল সংযমী ত্যাগনিষ্ঠ ও হিতব্রতী যুবক ছিল—যাহারা পাড়ার মধ্যে কোন কলঙ্ককে প্রশ্রয় দিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না। ভদ্রঘরের নরনারীর চরিত্রভ্রংশের কোনরূপ আভাস পাইলে, এই সকল যুবকের দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত এবং কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিত। পাড়ায় পাড়ায় নীতিশৈথিল্যের এমন অসংবৃত আত্মপ্রকাশ, সংযমহীন স্বাধীনতার এমন অকপট উল্লাস, নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের এমন প্রকাশ্য বাহাদুরি তখনকার দিনে অজ্ঞাত ও পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল।....

স্কুল কলেজ আপিস খোলা থাকার দিনে যে-কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যে-কোন একটা অলিগলির মধ্যকার পাড়ায় বেলা দশটা হইতে এগারোটার মধ্যে বেড়াইতে গেলে দেখিতে পাইবেন—এক এক দল স্থানীয় নিষ্কর্মা ছোকরা অথবা নিম্নশ্রেণীর নেশাখোর মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বাড়ির রোয়াকে, চায়ের দোকানের সম্মুখের বেঞ্চিতে, একতলা ঘরের জানালার ধারে, বিড়ি-সিগারেটের দোকানে, সাইকেল মেরামতের দোকানে ঘেঁট পাকাইয়া চোখ শানাইয়া বসিয়া আছে। স্কুলকলেজে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা যাইতেছে—তাহারা হাসাহাসি করিতেছে, শিষ দিতেছে, কোন্‌টা কাহার পছন্দসই সালঙ্কারে সরবে নির্দেশ করিতেছে, কেহ ইচ্ছা করিয়া সশব্দে হাঁচিতেছে ও কাশিতেছে, কেহ অত্যন্ত অশোভন ঠাট্টা শুনাইয়া দিতেছে; কেহ

নানা ঢঙে গান গাহিতেছে—"আকাশে চাঁদ ছিল রে," "এই কি গো শেষ দান বিরহ দিয়ে গেলে," "ও কেন গেল চলে কথাটি নাহি বলে"··· ইত্যাদি। ইহারা কখনও মেয়েদের গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়, কখনো কখনো কাগজের গুটি গায়ে ছুড়িয়া মারে, কখনো কখনো একটি বা একাধিক ছোকরা সাইকেল চড়িয়া একটি বিশেষ মেয়ের পিছু লয়। কোন শক্ত মেয়েদলের পাল্লায় পড়িয়া কেহ কেহ জব্দ হয়, কেহ কেহ আদালতে নীত হইয়া শাস্তি পায়। আদালতের বাহিরে অন্যায়রোধী যে সকল দুর্দান্ত ছেলে এই বদমায়েসদের দলকে শায়েস্তা করিতে পারে, তাহারা তখন স্কুলে কলেজে বা আপিসে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাদের প্রতাপ অপ্রতিহত গতিতে চলে।

সদর রাস্তায়ও দেখিবেন,—বেলা দশটা ও বেলা চারিটার পূর্ব হইতে রোয়াকে-রোয়াকে দোকানে দোকানে শত শত গোকুলের ষণ্ড বকগ্রীব হইয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। এতগুলা পাষণ্ডকে দলন করিবে কে?····

আমাদের পাড়ারই কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ীর বত্রিশ-তেত্রিশ-বর্ষ বয়স্ক পুত্রটিকে গত দশ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি—সে রৌদ্রবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বেলা সাড়ে-তিনটা চারিটার সময় দোকানের বাহিরে আসিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে, ঘন ঘন নস্য টানে ও স্কুলকলেজ-প্রত্যাগামিনী মেয়েদের সমীপবর্তী হইয়া নিষ্পলক নেত্র দিয়া বায়ু-সেবন করে!

জানালা ও ছাদের মহিমা

ছুটির দিন ছাড়া অন্যদিনের দ্বিপ্রহরগুলি ভদ্রঘরের স্খলিতচরিত্রা নারীর প্রণয়চর্যার নিরাপদ অবসর প্রদান করে। অনেক সুশীলা কুলবধূ এই সময় ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমায় বা সেলাই করে বা সংসারের

কাজ করে; পাশের ঘরে বা পাশের বাড়িতে কি হইতেছে তাহার খোঁজ বড়-একটা রাখে না। খোঁজ করিলে জানিতে পারে যে, অমুকবাবুর বধূর সহিত তাঁহার পিত্রালয়ের কোন সম্পর্কিত ভ্রাতা, কাকা বা মামা মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিতে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে অসময়ে স্বামী আফিস হইতে ফিরিয়া স্ত্রীর ব্যভিচার ধরিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে দুইটি পাশাপাশি বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়া নানা ছাঁদের আপত্তিকর নাটক অভিনীত হয়। এই সময়কার সিনেমাগৃহও নিরাপদ নয়; উহা বহু প্রণয়ীর সন্তিমির অভিসার-কুঞ্জে পরিণত হয়।

ভারতের বড় বড় শহরের ছাদে ছাদে তরুণ বয়সী মেয়েপুরুষের মধ্যে বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় যে বিপত্তিকর রোম্যান্সের হিল্লোল চলে, তাহার ধাক্কা সামলাইতে অনেক সংসারের তট ভাঙে, অনেক হৃদয় বিচূর্ণিত হয়, অনেক জীবন অকালে বিনষ্ট বা কালিমালিপ্ত হয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ঘুড়ি ও পোষা পায়রা মারফৎ তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে পত্রবিনিময় চলিত; কোথাও দুষ্ট-চরিত্রের দাসদাসী দূতিয়ালি করিত; কোথাও নাপিতানী গোয়ালিনী রজকিনীরাও কুলবালাদের পাপের ফাঁদে পা ফেলিতে প্রলুব্ধ করিত। আজকাল-কার ফ্ল্যাট, ব্যারাকবাড়া, মাঠকোঠার জানালা, ছাদ, সিঁড়ি, কলঘর ও রোয়াক্ স্ত্রীপুরুষের শুধু ইসারা, দৃষ্টি ও পত্র বিনিময় করিবারই অবাধ অবসর প্রদান করে না, স্পর্শ-বাক্য-চুম্বন-আলিঙ্গনাদি বিনিময়েরও শত রন্ধ্র যোগাইয়া দেয়।

সহবাসী ও প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্বে যত নারী প্রলুব্ধা ও প্রনষ্টা হইবার সুযোগ পাইত, এখন তদপেক্ষা বেশী পাইতেছে। কেন পাইতেছে, তাহার আন্তরিক ও বাহ্যিক অনেকগুলি কারণ আছে; তাহার অনেকগুলিকেই আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনার আওতায় আনিয়াছি। বাকিগুলি আপনাদের নিকট অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অন্নবস্ত্র, বিলাসদ্রব্য ও বাসগৃহের মূল্য যেমন দ্রুতবেগে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, জীবন ও জীবনের পবিত্রতার মূল্য তেমনি দ্রুতবেগে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহাদের পুরুষরা বাহিরে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য লইয়া কালাবাজার করে, তাহাদের মেয়েরা যদি চরিত্র লইয়া সখের বাজারে যায়—তাহা হইলে দোষ দিবেন কাহাকে ? যাহারা উদয়াস্ত খাটিয়াও স্ত্রীপুত্রের অন্নসংস্থান করিতে পারে না, রোগে ঔষধপত্র দিতে পারে না, শোকে অশ্রুজল শুকাইবার সময় পায় না, তাহাদের কন্যা ও ভগিনীদের কেহ কেহ যদি নিজেদের সৌন্দর্যকে কালাবাজারে বিকাইতে যায়, তাহা হইলে তাহারা কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হাত বাড়াইবে ? ধনাঢ্যরা আজকাল নিম্নমূল্যে দরিদ্রের পরিশ্রম ক্রয় করিতে চায়, অথচ দরিদ্রের অন্তঃপুরের পবিত্রতাকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে উন্মুখ হয়।

অর্থ বা সাচ্ছল্য লাভের প্রত্যাশা ছাড়াও অন্য বহু কারণে নারী কুপথের দিকে পা বাড়াইতে পারে, তাহা আপনাদিগকে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, আবার আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই। কাম-তাড়িতা হইয়াও যেমন যাইতে পারে, পিতামাতা বা বিমাতা, স্বামি-শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাশুর-জায়ের অমনোযোগিতা, অবমাননা ও অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াও যাইতে পারে, বিমূঢ় কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াও যাইতে পারে, উপায়ান্তর না দেখিয়া ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারে।

যাহা হউক, সহবাসী ও প্রতিবেশী-সংপৃক্ত কয়েকটি ঘটনার কথা আপনাদিগকে বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করি।....

দেবপ্রসাদের দুষ্প্রবৃত্তি

বৎসর খানেক মাত্র পূর্বের ঘটনা। দেবপ্রসাদ বসু নামক একটি যুবক ভবানীপুরের কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাড়িতে ভাড়াটে

ছিল। সে ক্রমে ক্রমে গৃহকর্তার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যাটির সহিত ভাব জমাইয়া ফেলে। তাহার মা দেবপ্রসাদের সহিত মেয়েকে বেশী মেশামিশি করিতে দিতেন না। শেষে দেখা গেল এক বাড়িতে থাকিয়াই তাহারা দুইজন প্রেমপত্র লেখালিখি করিতেছে। মেয়েটি হাঁটিয়া স্কুলে যাইত। স্কুলে যাওয়া বা আসার পথে দেবপ্রসাদ মাঝে মাঝে উহার সহিত কোন নিভৃত গলির মধ্যে দেখা করিত এবং বাড়িতে চিঠি দেওয়ার সুযোগ না পাইলে তাহার অকথিত বাণী-গ্রথিত উচ্ছ্বাস-গদগদ দীর্ঘ পত্রগুলি রাস্তার নিরালায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত। পিতা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া মেয়ের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। মাতাও মেয়ের উপর কড়া নজর রাখিলেন। দেবপ্রসাদকে যথাসাধ্য ভদ্র ভাষায় সাবধান করিয়া দেওয়া হইল।

গত বৎসর ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে মেয়েটি মাকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিল যে, সে স্কুলে ঐ একটি দিনের জন্য যাইবে, সেখানে নাকি কি একটা বিশেষ উৎসব আছে। মাতা অনেক আপত্তির পর শেষে সম্মতি দিলেন! কিন্তু সে স্কুলের দিকে না গিয়া পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী তাহার প্রণয়ীর সহিত দেশপ্রিয় পার্কে গিয়া সাক্ষাৎ করিল। সেখান হইতে তাহারা পূর্ণিয়ায় দেবপ্রসাদের ভগ্নীর বাড়িতে যায় এবং তথায় পতিপত্নীর ন্যায় বাস করিতে থাকে। কিছুদিন পরে পুলিশ তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করে। মেয়েটিকে পিতামাতার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে বলে যে, দেবপ্রসাদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে তাহার স্বামীর নিকট থাকিতে চায়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে হরণ করিবার অভিযোগে দেবপ্রসাদকে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। জুরি ও জজ তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।....

কামোন্মত্তা কৌশল্যার নারকীয় কৌশল

গত বাংলা ১৩৪৩ সালে লাহোর হাইকোর্টে কৌশল্যাদেবী ও হংসরাজের বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্যকর লোমহর্ষণ হত্যার মামলা উঠিয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকপাঠিকারই স্মরণ নাই। মামলায় প্রকাশ, হংসরাজ নামে এক ব্যক্তি কৌশল্যার স্বামীর গৃহে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিত। স্বামী বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করিয়া বাড়ির বাহির হয়, আর কৌশল্যা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইয়া যুবক হংসরাজের ঘরে গিয়া গুপ্তপ্রণয়লীলায় প্রমত্ত হয়। ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ি হইলে গৃহপার্শ্বস্থ প্রতিবেশীরা টের পায় এবং তাহার স্বামীকে সতর্ক করিয়া দেয়। কৌশল্যার স্বামী তাহার পত্নীর দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, অপমান করিয়া হংজরাজকে তাড়াইয়া দিল এবং স্ত্রীকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় শাসাইয়া দিল।

কিছুদিন চুপচাপ থাকিবার পর হংসরাজের সহিত কৌশল্যার লুকাইয়া পত্র-বিনিময় ও দেখাসাক্ষাৎ চলিতে আরম্ভ করিল। কৌশল্যা খাওয়াদাওয়ার পর বিতাড়িত হংসরাজের বিজন আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইত এবং দুই-তিন ঘণ্টা তথায় থাকিবার পর গৃহে ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এইরূপ ভয়ে-ভয়ে সংশয়ে-সংশয়ে লুকাইয়া-লুকাইয়া প্রেমলীলা চালাইতে হংসরাজের ঘোর আপত্তি; সে চায় কৌশল্যাকে পুরাপুরি-ভাবে একান্ত আপনার করিয়া। স্বামীর শাসন ও রক্তচক্ষুকে চির-নির্বাপিত করিয়া দিতে তাহারা উভয়ে বদ্ধপরিকর হইল।

একদিন কৌশল্যা হংসরাজের ডেরা হইতে আফিং আনিয়া, তাহা খাদ্যের সহিত মিশাইয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিল। দুর্ভাগা স্বামী তাহা খাইয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়িল। তখন কৌশল্যা তাড়াতাড়ি হংসরাজের নিকট গিয়া বলে যে, তাহার স্বামী জ্ঞানহারা

হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে মরে নাই। তাহার যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট আছে, সেটুকু নির্ঝঞ্ঝাটে বাহির করিয়া দেওয়া অবিলম্বে কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ হংসরাজ কংসরাজের নৃশংসতাকে বুকে ও বাহুতে সঞ্চয় করিয়া লইয়া কৌশল্যার গৃহে ছুটিয়া আসিল। কৌশল্যা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকৌতুকে দেখিল—হংসরাজ সিংহবিক্রমে তাহার হতচৈতন্য স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিল।

মৃতদেহ তাহারা দিনেদুপুরে আর কোথায় সরাইবে? বাড়ির উঠানে অল্প গর্ত করিয়া কোনমতে তাহা তাড়াতাড়ি পুঁতিয়া ফেলিল। স্বামীর সমাধির উপর প্রণয়ীযুগলের নিত্য শয়তানী লীলা নিরঙ্কুশভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে লাস পচিয়া মাটি ফুঁড়িয়া ভীষণ দুর্গন্ধ বাহির হইল। প্রতিবেশীরা কৌশল্যাকে তাহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত স্বামী কিছুদিনের জন্য শহরের বাহিরে গিয়াছেন। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ তাহারা সকলে সহজে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তারপর পাড়ায় যখন শব-পচা দুর্গন্ধ দুঃসহভাবে ছড়াইয়া পড়িল, তখন লোকে অতিষ্ঠ ও সন্দিগ্ধ হইয়া পৌরসমিতির স্বাস্থ্যবিভাগকে ও পরে পুলিসকে খবর দিল। পুলিস আসিয়া কৌশল্যার বাড়ি হইতে লাস খুঁড়িয়া বাহির করে। তারপর কৌশল্যা ও হংসরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়।...

লক্ষ্মীর স্বামী গলায় দড়ি দিল কেন

আর একটি অনুরূপ শোচনীয় ঘটনার কথা বলি।...

কলিকাতায় চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেনের বস্তির এক খোলার বাড়িতে তুলসীচরণ দাস তাহার পত্নী লক্ষ্মীবালাকে লইয়া বাস করিত। মধুসূদন অধিকারী ঐ বস্তিতে কাছাকাছি এক বাড়িতে বাস করিত।

তুলসী ও মধুসূদনের মধ্যে স্বভাবত যথেষ্ট জানাশোনা ছিল এবং তাহারা পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত করিত। মধুসূদন সুকৌশলে লক্ষ্মীবালার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলে ও চা-পাণ প্রভৃতি খাইবার অছিলায় ঘন ঘন তাহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে থাকে—বিশেষভাবে যখন তাহার স্বামী বাড়িতে না থাকিত। গত ১লা মার্চ তারিখে লক্ষ্মী স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মধুর সহিত কুলত্যাগ করে। যাইবার সময় স্বামিপ্রদত্ত যাবতীয় গহনাগাঁটি ও টাকাকড়ি লইয়া যায়।

তুলসী গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে ও পরে মধুসূদনকে অনুপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারে এবং থানায় গিয়া তাহাদের দুইজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে সে নারীসহায়-সমিতি নামক একটি হিতপ্রতিষ্ঠানের জনৈক পরিচালকের নিকট সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলে এবং তাঁহাকে কাঁদিয়া-কাটিয়া স্ত্রীকে খুঁজিয়া দিতে অনুরোধ করে। ঐ ভদ্রলোক শহরের নানা অঞ্চল খুঁজিয়া, শেষে শহরের উপকণ্ঠ প্রভৃতি খুঁজিয়া হতাশ হন্। তারপর একটা উড়ো খবরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মধ্যভারতে বিলাসপুরের নিকট নানঘাটে গিয়া তাহাদের সন্ধান পান্। সেখানে গিয়া নানা লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তিনি কোন গৃহস্থের গোয়ালঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন্; দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিতে পান—মধু ও লক্ষ্মী অতি কদর্য পরিবেশের মধ্যে একটি খাটিয়ার উপরে একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় পুলিশকে দিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া কলিকাতায় টানিয়া আনা হয়। চুরি-যাওয়া প্রায় সমস্ত জিনিসই তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হয়।

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ এন. খাস্তগীরের এজলাসে মধু ও লক্ষ্মীকে ১৫০০৲র অলঙ্কার চুরির-অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বিচার চলিবার সময় লক্ষ্মীর স্বামী পত্নীর কলঙ্ককর আচরণে ক্ষুব্ধ ও

লজ্জিত হইয়া একদিন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিল। ম্যাজিস্ট্রেট্ উভয় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উভয়ের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ করিয়া জরিমানা বিধান করেন। জরিমানা অনাদায়ে প্রত্যেককেই আরো দুই মাস করিয়া কারাবাস করিতে হইবে। পরোক্ষভাবে স্বামীর আত্মনাশের হেতু হওয়ার অপরাধে ঐ লক্ষ্মীছাড়া স্ত্রীলোকটির পৃথক ও কঠোরতর কোন সাজা হইল না!

ছয়মাস কারাগারে বাস করিয়া লক্ষ্মী বা মধুসূদনের মনে অনুতাপ জাগিবে কিনা, কঠোর শিক্ষা হইবে কিনা—তাহা একমাত্র শ্রীমধুসূদনই বলিতে পারেন। দুষ্টা স্ত্রীর প্রতি অতল মমতার জন্য একটি সৎপ্রকৃতি স্বামীর অমূল্যজীবন অকালে বিনষ্ট হইল।

সুরমার অদৃষ্ট

আমার কোন স্নেহভাজন পার্শ্বগ্রামবাসী কয়েক বৎসর পূর্বে আমার নিকট আসিয়া নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবৃত করেন ও একখানি পত্র নথীস্বরূপ দিয়া যান্। পত্রখানি আজো আমার নিকট রহিয়াছে। তিনি যেমন যেমন বলিয়াছিলেন, আমি তেমনি তেমনি লিখিয়া গিয়াছি। কোথাও কোথাও তাঁহার ভাষার উপর প্রয়োজনমতো যৎসামান্য খোদ্‌কারি করিয়া গিয়াছি; সামান্য কিছু অবান্তর অংশ বাদ দিয়া আখ্যানভাগকে সাধ্যমতো সঙ্কুচিত ও সারবহুল করিবার চেষ্টা করিয়াছি।—

"আমার এক শালীর কথা আপনাকে বলি। তাকে আপনি নিশ্চয় একবার দেখেছেন। [তাহার নকল নাম রাখা যাক 'সুরমা'।] সে আমার আপন শালী নয়, জ্যেঠ্‌তুতো শালী। আমার শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয় তা বোধ হয় আপনি জানেন। সুরমার পিতা অনেকদিন আগে থেকেই আমার শ্বশুরের সঙ্গে পৃথক্।

তাঁর অবস্থা আমার শ্বশুরের চেয়েও শোচনীয়। জমিদারি সেরেস্তায় আমরণ গোমস্তাগিরি কোরে গিয়েছেন। প্রথম তিন টাকা মাইনে ছিল, তারপর কেঁদে-ককিয়ে সুপারিষ ধোরে আট টাকায় ওঠে। বছরের শেষে শতখানেক টাকা তহরির অংশ পেতেন। ধান ছিল মাস চার-পাঁচ চলবার মতো। এই সামান্য আয় দিয়ে তাঁকে প্রতিপালন কত্তে হয়েছে চার-চারটি মেয়ে আর তিনটি ছেলেকে। বছর ৩।৪ আগে জ্যেঠশ্বশুর মশাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। একটী ছেলে দশ বছর বয়সে মারা যায়; বাকি দুটোর কোনটাই মানুষ হয়নি। ছোটটি শহরের দর্জির দোকানে কাজ করে। আর বড়টী লরি চালায়, মদ খায় আর বেশ্যাবাড়ি পোড়ে থাকে। বাড়িতে কখনও এক পয়সা পাঠায়নি। যাক্, এখন মেয়েদের কথা বলি। মেয়েগুলি একটু বেঁটে গড়নের হলেও মোটামুটি সুরূপা ও স্বাস্থ্যবতী। তৃতীয়া মেয়ে সুরমা ওর মধ্যে একটু নিরেস ও মাটো। তবে তার শরীর সব বোনের মধ্যে ডাঁটো। রান্‌তে পারে ভালো, খাট্‌তে পারে খুব, কিন্তু বাড়ীর কেউ খাটতে বল্লে খাটবে না। একটু খামখেয়ালী, একটু মুখরা। দুপুর বেলায় পানদোক্তা মুখে দিয়ে পাড়ায় তাস খেলতে যাবে, ফিরবে সেই বেলা পড়্‌লে। মা কিংবা ঠাকুমা বক্‌লে গ্রাহ্যই করে না, বরং কড়া কড়া দু'কথা শুনিয়ে দেবে। গায়ে পোড়ে আলাপ করা ও বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প বলার অভ্যাস খুব ছিল। গল্পের বই পেলে আহারনিদ্রা ভুলে শুয়ে শুয়ে এক-নাগাড় পড়ত।

জ্যেঠশ্বশুর একরকম বিনাপয়সায় প্রথম দুটি মেয়েকে তাদের তেরো-চোদ্দ বছর বয়েসের সময় ভালো ঘরে ভালো বরের হাতে সঁপে দেন। একে কুলীনের মেয়ে, তায় রং একটু ফর্সা, তাদের লুফে নিয়ে গেল মৌলিকের দল। সেজোটির চোদ্দ বছর পার হোয়ে যায়-যায়। বাপমা ভাবনায় পড়লেন। দু'তিন জায়গা থেকে

দেখ্‌তে এসে, মেয়ে একটু কালো দেখে তারা পেছিয়ে গেল। বাপের আরো চিন্তা হোল—তিনি বাতে পঙ্গু হোয়ে তিন মাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বোসে আছেন, সংসার অচল; তার ওপর মাঝে মাঝে পালাজ্বর আসছে তাঁর। এই মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেতে পাল্লে তিনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারেন। বড় ছেলেটা তখন কল্‌কাতায় গিয়ে মটর চালানো শিখ্‌ছে।

অনেক খুঁজে পেতে এক দোজপক্ষের মৌলিক বরের সঙ্গে সুরমার বিয়ে হোল। এক পয়সা লাগ্‌ল না। কনের বয়স পনেরো, বরের বয়স পঞ্চাশের কম নয়। বেঁটে ও মোটা, রংটি কালো কুচকুচে, একতাড়া প্রায়-পাকা গোঁফ, বেশ একটুখানি নেয়াপাতি ভুঁড়ি আছে! কোন্ সাহেব কোম্পানির পাটের খরিদকার; তিন মাস খেটে নিজের খরচখরচা বাদে হাজার তিনেক টাকা রোজগার করেন, আর বাকি ন'মাস বাড়ি বোসে তাসপাশা খেলে কাটান্। লোকটির নাম রাখা গেল মহিমবাবু।

বিয়ের পর প্রথম বাপের বাড়িতে ফিরে এসে সুরমা তার বান্ধবীদের কাছে পষ্ট খুলে বল্ল এবং মাঠাকুরমার কাছে কতকটা আভাসে জানিয়ে দিল যে, স্বামী তার পছন্দ হয়নি। শাশুড়ি চোখে দেখ্‌তে পান্ না, গায়ের নানাস্থানে ধবল, তার ওপর যেমন নোংরা তেমনি ঝগড়াটে। ওদের বাড়িটা মাঝামাঝি রকমের একতলা দালান; বাগবাগিচা প্রচুর আছে, ধানপাণও মন্দ নেই। একদিন স্বামীর মুখে সে মদের গন্ধ পেয়েছে। লোকটি স্ত্রীকে গয়না আর কাপড় দিয়েছে বেশ, নৌকোয় নিয়ে যেতে যেতে সোহাগবাণী শুনিয়েছে প্রচুর, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী যুবতী স্ত্রীকে খুশি করবার মতো দৈহিক উপকরণ বিশেষ-কিছু অবশিষ্ট নেই তার।

এক বছর পরে সুরমা শীর্ণবিশীর্ণ হোয়ে ও বাধকের ব্যথা নিয়ে

পিত্রালয়ে ফিরে এল। স্বামীর গুণগ্রাম তার মুখে আরো বেশী কোরে প্রকাশ পেল। লোকটি অত্যন্ত খরুচে ও খোশ্‌মেজাজী, কিন্তু মদ খেলে তার মাথা বেজায় গরম হোয়ে ওঠে। তখন তরুণী ভার্যাকে গালি পাড়তে বা দুই-একটা চড়চাপড় মারতেও সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। অনেকগুলি নিষ্কর্মা বন্ধু আর মোসাহেব আছে ওর। মাঝে মাঝে কীর্তনওয়ালী ও নাচওয়ালী গঞ্জ থেকে বায়না কোরে আনায় এবং তাদের ও মোসাহেবদের নিয়ে একখানা ভাড়া-করা ভাওয়ালেতে চোড়ে সারারাত্র ফুর্তি করে; সঙ্গে পাঁঠার মাংস ও মদ থাকে। একদিন কি দু'দিন পরে ভাওয়ালে ফিরে এসে বাড়ির ঘাটে লাগে।

শ্বশুরবাড়িতে সুরমাকে ফিরে আসতেই হোল। কারণ বাপের বাড়িতে সদ্যোবিবাহিত মেয়ের বেশীদিন পোড়ে থাকাটা নিন্দার ব্যাপার। আর তা ছাড়া বাপের খাওয়াবারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে সুরমা কোন দিক দিয়েই আনন্দ পায় না। স্বামী কার্যোপলক্ষে তিন মাসের ওপর বিদেশে থাকেন; বাকি যে কয় মাস গ্রামে থাকেন, তার অর্ধেক দিনই তিনি রাত্রিতে বাড়িতে থাকেন না। বছরের শেষে যখন ধান আর পয়সা দুই-ই ফুরিয়ে আসে, তখন স্বামীর জলবিহারে অনেকখানি ভাঁটা পড়ে এবং ২।১ খানা গয়না বন্ধক রেখে কর্জ করার প্রবৃত্তি বাড়ে। স্ত্রীর আপত্তি ও জননীর আকুতি মহিমবাবুর অপব্যয়ের পথ রোধ করতে পারে না।

সেবার পাটের মর্শুমে মহিমবাবু গেলেন সিরাজগঞ্জে। স্বামী সুরমাকে বারবার বলে গেলেন মিষ্টি কথার ভেতর ভয়-দেখানোর রসান্ দিয়ে,—সে যেন তার শাশুড়িকে আদরযত্ন করতে কোন রকম ত্রুটি না করে; মা যদি সদ্ব্যবহারের সার্টিফিকেট দেন্, তাহলে ফিরে এসে তাকে একখানা পছন্দসই ভারী গয়না গড়িয়ে দেবেন তিনি। আর,

মায়ের ধবল সারার জন্যে যে কবিরাজী তেল কিনে আনা হয়েচে, সেটা যেন স্নানের আগে এক ঘণ্টা ধোরে তাঁর অঙ্গে ভালো কোরে মালিশ কোরে দেওয়া হয়।....সুরমা স্বামীর হুকুম বা অনুরোধ মান্‌তে পার্‌ল না; গয়নার চেয়ে বড়ো জিনিস সে চেয়েছিল—পায়নি। শাশুড়ি কথায় কথায় তাকে পিতৃকুল মাতৃকুল তুলে গালি দিতে লাগ্‌লেন। কাজেই সে তেল মালিস করা তো বন্ধ কোরে দিলই, শাশুড়িকে সময়মতো রেঁধে খাওয়াতেও ত্রুটি কর্‌তে লাগ্‌ল।

শেষে একদিন শাশুড়ি-বউয়ে হাতাহাতি হবার উপক্রম। পাড়ার গৃহিণীরা এসে সুরমাকে ঘিরে ধোরে যাচ্ছেতাই গালাগালি কর্‌ল। সুরমা এতগুলো রথীর ব্যূহ ভেদ কর্‌তে পার্‌ল না, পরাজয় মেনে চুপ কোরে রইল। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে একটি প্রাণের কোণ থেকে এক ফোঁটা সুমিষ্ট সহানুভূতি ঝরে পড়্‌ল সুরমার প্রাণের ওপর। ছেলেটির নাম কিরণ। মহিমবাবুর জ্যেঠতুতো বোনের ছেলে সে। বাল্যে পিতৃমাতৃহারা। কিছুদিন এখানে থেকে স্কুলে পড়্‌ত, তারপর ম্যাট্রিক পাস কোরে সে নিকটস্থ শহরে কলেজে পড়্‌তে যায়। বি এ. পড়বার সময় সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কংগ্রেস-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে। তদবধি সে কংগ্রেস-কর্মী। এই জেলার সর্বত্র সে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করে, পুলিসের তাড়া ও প্রহার খায়, পিকেটিং কর্‌তে গিয়ে মার খায়—জেলে যায়। প্রচারোদ্দেশ্যে যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে দু'একদিনের জন্যে সে মামাবাড়ির পুরাতন আতিথ্য গ্রহণ করে। কিরণই তার দিদিমার অসাক্ষাতে এই ভাগ্যনিপীড়িতা মামীটিকে গভীর অনুকম্পা জানাল এবং তাকে মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও কংগ্রেসনীতি বিষয়ে লেখা ক'খানা ছোট বই পড়তে দিল। একদিন সুরমা তার শাশুড়িকে কিছু না জানিয়ে এবং স্বামীকে একখানা পোষ্টকার্ডে দু'ছত্র লিখে পাঠিয়ে কিরণের

সঙ্গে চলে এল বাপের বাড়ি। এবার সে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া ও সংসার-খরচ-থেকে-লুকিয়ে-জমানো সত্তর-আশী টাকা সঙ্গে নিল, আর নিল হাজার দুই টাকার গয়না।

বাপের তখন চাকুরি গেছে। জমিদারি সেরেস্তায় সামান্য চাকুরিটুকু তিনি বজায় রাখ্‌তে পাল্লেন না দুরন্ত বাতব্যাধির জন্যে। সদাশয় জমিদার তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করালেন এবং মাসে মাসে ৪৲ কোরে পেন্সন দেবার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। কিন্তু সেই সস্তার দিনেও চারটাকায় একটা ভদ্রলোকের সংসার কোনমতেই চল্‌ত না। স-মুদ্রা সালঙ্কারা সুরমা এসে পড়তেই তার বাবা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বাতের চিকিৎসায় ও সংসার-খরচে তিনি মেয়ের হাতের সব ক'টি টাকাই মাস দুয়েকের মধ্যে ফুঁকে দিলেন। শেষে কি-একটা পুরোণো দেনার ডিক্রী শোধ করবার জন্যে তিনি মেয়ের একজোড়া চুড়ি বন্ধক দিতেও বাধ্য হলেন। মেয়েকে আশ্বাস দিলেন যে, পনেরো দিনের মধ্যেই চুড়ি ছাড়িয়ে আনবেন।

মহিমবাবু কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে, মা ও প্রতিবেশিনীদের কাছে স্ত্রীর গুণের কথা সমস্ত শুন্‌লেন। দিন কয়েক পরে তিনি শ্বশুরবাড়ি এসে উদয় হলেন। সেখানে এসে শ্বশুরের কীর্তি-কলাপের কিছু পরিচয় পেলেন। চুপচাপ্ কোরে বন্ধকী চুড়ি দুটো টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি সস্ত্রীক দেশে ফিরলেন। স্ত্রীকে বিশেষ কিছু কটুকাটব্য করলেন না এই ভেবে যে, তার পঙ্গু অথর্ব মা ছাড়া সংসারে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই; তুতিরে-পাতিয়ে ওকে দিয়ে ঘরগৃহস্থালির কাজগুলো যতদিন পারা যায় করিয়ে নিতে হবে।

পরের বছর পাটের মর্শুম অত্যন্ত খারাপ হ'ল। আগের বছর থেকেই পাটের চাহিদা স্বদেশেবিদেশে কম্‌তে আরম্ভ করেছিল। সেবার প্রচুর পাট জন্মানো সত্বেও সমস্ত পাটক্রয়ের আপিস কেনার

কাজ যথেষ্ট কমিয়ে দিল, ছোট ছোট মোকামে কোন ক্রেতাই পাঠানোই হ'ল না। আশ্বিন মাসের শেষে মহিমবাবু মোকামে বোসে তাঁর চাকুরি ছাঁটাইয়ের পত্র পেলেন এবং বহুকষ্টে হাজার দুই টাকা পারিশ্রমিক সংগ্রহ কোরে শুষ্কমুখে দেশে ফিরে এলেন। দেশে এসে শোনেন যে, তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য জনকয়েক মহিলা কিরণের নেতৃত্বে -গড়া বাজারে একটা মদের দোকানে পিকেটিং কর্‌তে গিয়ে ধরা পড়েছে। কিরণের ছ'মাস এবং তিনজন মহিলার ১৫৲ কোরে জরিমানা অনাদায়ে দুই সপ্তাহ কোরে কারাদণ্ড হয়েছে; ঐ তিন-জনের মধ্যে একজন হ'ল সুরমা।....সুরমা কারাবাসান্তে যখন স্বামীর গ্রামে ফিরে এল, তখন তাঁর স্বামী ও শাশুড়ি দু'জনেই অসুখে শয্যাশায়ী। দিনরাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সে দুজনের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগ্‌ল। শাশুড়ি সরলেন, স্বামী সারলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধের তিনচারদিন পূর্ব থেকেই গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মাতব্বরগণ বল্‌লেন যে, সুরমাকে পিকেটিংয়ের সময় একটা মুচি মাতাল ধাক্কা দিয়েছিল—পাহারওয়ালা হাত ধোরে টেনেছিল, তা ছাড়া কিরণের সঙ্গে তার আচারব্যবহারও সন্দেহজনক; সর্বোপরি সে জেলে গিয়ে সর্বজাতির সঙ্গে খেয়েছে ও থেকেছে। সুতরাং তাকে নিয়ে ঘর করলে তাঁরা কেউ শ্রাদ্ধে যোগ দিতে পারবেন না—যদিও মহিমের মায়ের মৃতদেহ বহন ও দাহের সময় ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা কোন উচ্চবাচ্য করেননি। মহিমবাবু সকুণ্ঠায় এ কথা সুরমার কানে তুল্‌তেই সে বাপের বাড়ীতে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। মহিমবাবুর আর সে তেজ নেই, তিনি একেবারে কেঁচো হয়ে গেছেন। স্ত্রীকে বল্লেন, শীগ্‌গিরই তিনি কল্‌কাতায় চাকুরির সন্ধানে যাবেন। চাকুরি পেলেই সেখানে একটা বাসা কোরে তাকে নিয়ে যাবেন; আপাতত তিনি তার খরচের জন্যে

মাসে মাসে দশ টাকা কোরে পাঠাবেন। গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে সুরমা চলে এল বাপের বাড়ি।

বাপের দুরবস্থার চরম। ভাই দুটির কেউ মানুষ হয়নি। ছোট বোনটার এক মধ্যবয়স্ক দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে কোন শহরে ফলের দোকান করে। পিতা বাতে শয্যাশায়ী; একবেলা তাঁদের আহার কোনমতে জোটে, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও পয়সা নেই। সুরমা এবার দু'গাছা চুড়ি বাঁধা না রেখে একেবারে বিক্রি কোরে ফেল্লে। তাই দিয়ে কিছুদিন সংসার খরচ ও বাপের চিকিৎসা চালাল। ছোট ভাইটি—যে দাদার দেখাদেখি বাড়ির থালা ঘটিবাটি চুরি কোরে নেশাভাঙ্ করে, তাকে সে কিছু টাকা দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দিল দর্জির কাজ শেখ্‌বার জন্যে। মেয়ের যত্ন পেয়েও বাপ বাঁচলেন না। তাঁর শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে সুরমার হাতের আরো দু'গাছা চুড়ি বিক্রয় করতে হোল।

ওদিকে মহিমবাবু ক্রমাগত ম্যালেরিয়া জ্বরে পোড়ে ভুগ্‌ছেন। অবস্থা কাহিল। এক বৃদ্ধা গ্রাম-সম্পর্কিতা বিধবা বৌদি তাঁর বাড়িতে এসে থেকে, তাঁর সেবা কর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে হাতের পাতের সব কিছুই ফুরিয়ে গেল। একখানা ভালো তালুক, একটা বাগান এবং দুই পক্ষের স্ত্রীর যা ২।১ খানা গয়না তাঁর কাছে ছিল সমস্তই বিকিয়ে গেল। এইভাবে বৎসরাধিক কাল চলার পর একটু সুস্থ হোয়ে অতি কষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ কোরে তিনি কল্‌কাতায় এলেন চাকরির সন্ধানে। স্ত্রীকে দশটাকা পাঠানো তিনি বাধ্য হোয়ে বন্ধ করে দিলেন। শেষে চিঠি লেখাটাও ছেড়ে দিলেন—হয় লজ্জায় নয় বিতৃষ্ণায়।

দুর্গতির চরম সীমায় পৌছিয়ে এবং কলকাতা-প্রবাসী ড্রাইভার ভাইটির কোন সাহায্য না পেয়ে, একটি নাবালক ছোট ভাই ও বিধবা মাকে নিয়ে সুরমা এসে উঠ্‌ল খ- শহরে তার এক খুড়তুতো

ভাই মাণিকের বাসায়। মাণিক অবিবাহিত, সচ্চরিত্র ও দেশহিত-কামী; জেলাবোর্ডে অল্প মাহিনায় চাকরি করে। তার সঙ্গে বাস করেন মা ও একটি ছোট ভাই—কলেজের ছাত্র। বাড়িটি ছোট্ট, উপরে দু'খানা ঘর, নীচে দু'খানা। নীচের দু'খানার মধ্যে একখানা রান্নার আর একখানা বৈঠকখানা ও শোয়ার ঘর-রূপে ব্যবহৃত হয়। এই বাড়ির দোতলার একখানা ঘরে দু'টি ভাই ভাড়াটে থাকে। বড় ভাইটি বন-বিভাগের এক কাঁচা পদের কেরানি, ছোট ভাইটি মাণিকের ভাইয়ের সঙ্গে কলেজে একশ্রেণীতে পড়ে। [এই কেরানিটির নকল নাম বিভাস রাখা গেল।] মাণিক ও বিভাস কেউই বিয়ে করেনি; এরা প্রায় একবয়সী, ঘটনার প্রারম্ভে এদের বয়স ছিল সাতাশ-আটাশের মধ্যে।

মাণিকের মেজো ভাই অন্য এক শহরে ফৌজদারী আদালতে আম্‌লার পদে সদ্য নিযুক্ত হওয়ায়, মাণিকের মা চলে গেলেন সেই শহরে মেজো ছেলেটির বাসায়। তাঁর বড় জায়ের ওপর ভার দিয়ে গেলেন ছেলে দুটির তত্ত্বাবধান করার। মাণিক আর তার ছোট ভাই উপরের ঘর খানা ছেড়ে দিল তাদের জ্যাঠাইমা, সুরমা আর তার ছোট ভাইকে; তারা দু'জনে শুতে লাগ্‌ল বৈঠকখানা-ঘরে।...এইখান থেকেই সুরু হ'ল সুরমার জীবনে এক বিপ্লবাত্মক অধ্যায়।

বিভাসের সঙ্গে তাদের যে সামান্য পরিচয় ও আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল, সেটা সুরমার ক্ষেত্রে বেশ ধীরে ধীরে অসামান্য আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হ'তে লাগ্‌ল। বিভাস আর তারভাই আগে হোটেলে খেত; সুরমা মাণিক-দাদাকে ধোরে ওদের খাওয়ার বন্দোবস্ত তাদের রান্নাঘরেই কোরে নিল। বিভাস খাওয়া বাবদ আন্দাজমতো একটা খরচ মাণিককে দিতে প্রতিশ্রুত হ'ল। একবেলা সুরমা আর একবেলা সুরমার মা রানতেন। রন্ধনে হাতযশ মা-মেয়ে

দুজনেরই ছিল। রন্ধন ও পরিবেশনের ভেতর দিয়েই উভয়ের মধ্যে আলাপের বন্ধনটা হয়ে উঠ্‌ল শক্ত ও দুশ্ছেদ্য। তারপর সেটা আরো শক্তি সঞ্চয় করল শিক্ষকছাত্রীর সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে। গ্রামে থেকে লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগসুবিধা পায়নি সুরমা; কিরণ মাঝে মাঝে এসে তার মামীকে বাংলা ভাষার তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের সন্ধান দিয়ে গেছে; ওকে ভালো ভালো কাব্য, উপন্যাস ও স্বদেশী বই উপহার দিয়েছে। একটু আধটু ইংরেজী পড়্‌তেও শিখিয়েছিল কিরণই ওকে। বেশ প্রখর ছিল সুরমার বুদ্ধি ও স্মৃতি, শেখবার ও জানবার উৎসাহ ছিল ওর অদম্য। সন্ধ্যার পর বিভাসের কাছে সে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ করল এবং বছর দুয়েকের মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে ব'লে সংকল্প করল।

শিক্ষক ও ছাত্রীর পড়া ও অ-পড়ার গল্প এত অনর্গলপ্রবাহী, ঐকান্তিক ও বিতর্কমুখর হয়ে উঠ্‌ল যে, বিভাসের ছোট ভাইটি সন্ধ্যার পর দোতলার ঘর থেকে বই হাতে কোরে একতলায় মাণিকের ভাইয়ের কাছে পড়্‌তে নেমে আস্‌তে বাধ্য হল। খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে একঘুম ঘুমোবার পর ছোটভাইটি এক-এক দিন মাঝরাতে জেগে উঠে শুন্‌তে পেত—অন্ধকারের মধ্যে দু'টি সংলগ্ন কণ্ঠ নিম্নস্বরে অবোধ্যভাবে বোকে চলেছে অবিশ্রান্ত। দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা ছিল, সেই দরজা দিয়ে সুরমা প্রায় প্রতি রাত্রেই প্রবেশ করত বিভাসের ঘরে; নিজের ঘরে ফিরত শেষরাত্রে।

রাত্রি বারোটার সময় সুরমার মা একদিন মেয়েকে বিভাসের সঙ্গে কথা কইতে শুনে, তাকে নিজের ঘরে এসে শুতে আস্‌বার জন্যে ডাকলেন, 'যাচ্ছি' ব'লে সে গেল না। আর একদিন দুপুর রাতে জেগে মেয়েকে বিছানায় না দেখে পরদিন সকালে তাকে একান্তে ডেকে খানিকটা ভর্ৎসনাপূর্ণ উপদেশ দিলেন। তাতে মেয়ে বেশ ঝাঁঝালো

স্বরে মাকে শুনিয়ে দিল, "বুড়ো অশক্ত স্বামীর সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে গলায় পাথর বেঁধে আমায় নদীর জলে ফেলে দিতে পারোনি? আমার রক্তমাংসের শরীর তো, শুধু দুটো খেতে পর্‌তে পেলেই আমার সব অভাব দূর হয় না—তা বোঝবার শক্তি নেই তোমাদের! চল্লিশ বছর স্বামী নিয়ে ঘর করেছ কিনা, শাস্ত্রের দোহাই পাড়্‌তে সেইজন্যে তোমার মুখে বাধে না।"

এর কিছুদিন বাদে একদিন মহিমবাবু সুরমাকে কল্‌কাতায় নিয়ে যাবার জন্যে খ-য় উপস্থিত হলেন। যে পাটের অফিসের তিনি পার্চেজার ছিলেন, তার হেড অফিসে বড়বাবু ও ছোট সাহেবের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করার পর তাঁর ৪৫৲ মাইনেয় একটি কেরানির চাক্‌রি হয়েছে। পাঁচ টাকায় তিনি খিদিরপুরে মাঠকোঠার একখানি কামরা ভাড়া কোরেছেন; সেইখানে সুরমাকে নিয়ে গিয়ে নূতন কোরে সংসার পাতবেন। দেশের বাড়ি ও অবশিষ্ট জমিজমা বিক্রি কোরে দিয়ে তিনি হাজার দুই টাকা পেয়েছেন; একটা দোকান-ঘর খালি পেলে তিনি চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে একখানা মণিহারী দোকান খুলবেন। সুরমা গেল না কলকাতায়। দু'দিন অসুখে অছিলা কোরে মুখ গুঁজ্‌ড়ে বিছানায় পোড়ে রইল, স্বামীর সঙ্গে ভালো কোরে কথাও কইল না। মাণিক ভেতরকার ব্যাপার কিছু কিছু জান্‌তে পেরেছিল, সে-ও বোনকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ও ধম্‌কে রাজী করাতে পার্‌ল না। অগত্যা সে মহিমবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌ল যে, আগামী বড়দিনের বন্ধে ভগ্নীকে নিজে সঙ্গে কোরে কল্‌কাতায় তাঁর বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে।

কিন্তু মাণিকের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভবপর হোয়ে উঠ্‌ল না। ইতোমধ্যে মহিমবাবু অগত্যা তাঁর দূরসম্পর্কীয়া অনাথা বৌদিটিকে কলকাতার বাসায় এনে রাখ্‌লেন। দেশের একটা ছেলেকে কর্মচারী

হিসেবে রেখে তিনি একটি ছোটখাটো মণিহারী দোকান খুল্লেন। কিন্তু ছেলেটি মাস দু'য়েকের মধ্যে মালে ও মুদ্রায় হাজার খানেক টাকা আত্মসাৎ কোরে বেমালুম স'রে পড়্ল। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে বাত এসে মহিমবাবুকে এমনভাবে চেপে ধর্ল যে, মাসের মধ্যে দশদিন তাঁর আফিস কামাই হয় ও মাইনে কাটা যায়। শেষটা দোকানও উঠ্ল, চাক্‌রিও ছুট্ল। আবার দারুণ কষ্টের মধ্যে পড়লেন তিনি। এ কষ্টের ভেতর সুরমাকে টেনে না এনে তিনি ভালই কোরেছেন বোলে নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগ্লেন।....

আমার স্ত্রীর এই সময় প্রসব হবার কথা। সংসারে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই। স্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী সুরমার মাকে মাস দুয়েকের জন্যে কল্‌কাতায় এসে থাক্‌তে অনুরোধ কোরে পত্র দিলাম। তার মা না এসে সুরমা নিজে এসে উপস্থিত হ'ল। রান্নার মতো রোগী ও পোয়াতির সেবাযত্নের একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল সুরমার। আমরা তাকে পেয়ে খুশীই হলুম। যথাসময়ে নির্বিঘ্নে প্রসব হোয়ে গেল।

রান্নাবান্না ও আঁতুড়ের খিজমৎ খাটার কাজ সুরমা বেশ আগ্রহের সঙ্গে কোরে যেতে লাগ্ল। এই সময় লক্ষ্য করি যে, সপ্তাহে ২।৩ বার কোরে খ- থেকে সুরমার নামে খামে চিঠি আস্‌ছে আর সুরমা চিঠির উত্তর লিখে দুপুরে নিজে ডাকে দিয়ে আস্‌ছে। এর মধ্যে মাণিক আমায় একখানা পত্র লিখে জানায় যে, আমার দরকার মিটে গেলে সুরমাকে যেন তার স্বামীর বাসায় পাঠিয়ে দিই। স্ত্রী সুস্থ হোয়ে সংসারের ভার গ্রহণ কর্লে, আমি সুরমাকে শিগ্‌গির তার স্বামীর বাসায় দিয়ে আস্‌ব বল্লুম। সুরমা বল্ল যে, আরো কিছুদিন পরে স্বামিগৃহে যাবে। একদিন খিদিরপুর মনসাতলায় মহিমবাবুর ঠিকানা খুঁজে গিয়ে দেখি যে, তিনি দিন পনেরো হোল ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে রিক্তহস্তে বিলাসপুরে তাঁর এক ভগ্নীপতির কাছে চোলে গিয়েছেন।

সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে মাণিককে চিঠি লিখ্লুম, সুরমাকেও সব কথা বল্লুম। সুরমা বল্ল যে, সে শিগ্‌গিরই দার্জিলিংয়ে নার্সিং শিখতে যাচ্ছে; তাদের খ-য়ের বাড়ীতে বিভাসবাবু নামে যে ভদ্রলোকটি থাকেন, তিনিই ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছেন। দিনকয়েকের মধ্যে সুরমার মা কল্‌কাতায় এলেন এবং বিভাস সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা আমাকে গোপনে জানালেন। তাইতে জান্‌তে পারলুম যে, এক বছরের ওপর ওরা উভয়ে উভয়কে ভালবেসেছে এবং মা-ভাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও একত্র প্রায়ই রাত্রি যাপন করেছে। সুরমার মা বল্লেন, মাণিক বিভাসকে বাড়ি থেকে উঠে যেতে বলেছিল, সে উঠে যাবে-যাবে কচ্ছে এমন সময় তার বদ্‌লির খবর এল; দার্জিলিংয়ের কাছে কোন একটা জায়গায় সে বদ্‌লি হয়েছে। কিছুদিন হ'ল সে দার্জিলিং চলে গেছে। সুরমার নার্সিং পড়ার কথা একটা ছুতো মাত্র, আসলে ও দার্জিলিং গিয়ে বিভাসের কাছে থাক্‌বে। এখান থেকে বিভাস ওকে নিয়ে যাবে। বংশে কালি দিলে ও, ছিঃ ছিঃ, স্বামী থাক্‌তে শেষটা কিনা পরপুরুষকে—, এর চেয়ে মরণ যে ওর ছিল ভালো! সুরমার মা আরো চুপি চুপি বললেন, বোধহয় বিভাসের দ্বারা ওর গর্ভ হয়েছে। মাণিক জানতে পেরে ওঁকে বলেছিল কোন দাই-টাইয়ের কাছ থেকে ওষুধ জেনে নিয়ে গর্ভ নষ্ট কোরে ফেলতে, সুরমা রাজী হয়নি তাতে। তার মা হওয়ার নাকি বড় সাধ। মরণ আর কি, এইভাবে কি মা না হলেই নয়?....

দিন কয়েক পরে সুরমাকে একান্তে ডেকে একটু জেরা করতেই সে লজ্জার বাঁধ ভেঙে দিয়ে সমস্ত কথা খুলে বল্ল আমায়। স্বীকার কর্ল সে চারমাসের গর্ভবতী। হয় মৃত্যু নয় বিভাস ছাড়া তার আর গতি নেই। স্বামী তার জীবনের একটা বিভীষিকাময়ী দুর্ঘটনা—তাকে সে ভুলতেও পারবে না, বরদাস্ত কর্‌তেও পার্‌বে না।....

দিন কয়েক পরে সে বিভাসের সঙ্গে দার্জিলিং চোলে গেল। সুরমার মা-ও ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে থ-য় ফিরে চলে গেলেন।

বিভাসকে দেখ্‌লুম—তার চেহারা বেশ লম্বা; ছিপ্‌ছিপে গড়ন, কিন্তু তার মধ্যে প্রখর প্রাণশক্তির যেন একটা আভা মাখানো আছে। রঙ্‌ বেশ কালো, চুলগুলি কোঁকড়া, নাকটি বাঁশির মতো, চোখ দুটি টানাটানা। তার মুখে বা কথাবার্তার ভাবে কোথাও বোঝা গেল না যে, সুরমাকে ভালবেসে ও অবৈধভাবে তার গর্ভোৎপাদন কোরে সে গুরুতর অপরাধ কোরেছে এবং সেজন্যে তার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনার ঠাঁই আছে। সে আমাদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করল যে, আমরা যেন সকলেই তার ও সুরমার প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল।

কয়েক মাস পরে দার্জিলিং থেকে সুরমার একখানা পত্র পাই। [পত্রখানার অপ্রয়োজনীয় কতকাংশ বাদ দিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—]

"এ পর্য্যন্ত আপনার নিকট কোন চিঠি দিই নাই। আমার অবস্থা সবই বুঝিতেছেন।...গত শ্রাবণ মাসে একটি ছেলে হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক বিপদে পড়িয়াছি। এখানে থাকিতে হইলে পুলিস-পাশ নিয়া থাকিতে হয় তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। ঐ পাশ আমার নেওয়া হয় নাই; কারণ পাশ নিতে গেলে আদি অন্ত সমস্তই পুলিসে খোঁজ করিবে।...যদি জানিতে পারে যে, আমার পাশ নেই, তবে সঙ্গে সঙ্গে এঁর চাকুরি খতম। যার অশ্রয়ে আছি ও থাকিব, সেই যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তখন আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব। সেইজন্য এখন হইতে সাবধান হওয়াই ভাল।

"এদিকে ছেলেটার জন্য আর এক ভাবনা হইয়াছে, কারণ উহার মায়া কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমি উহাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না। আজ এই বিপদে আপনাকে

জানান ভিন্ন আমার অন্য কেহ নেই। আমাকে যদি কোথাও থাকিয়া নার্সিং শিক্ষার একটু ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, অবশ্য ছেলেটি নিয়া থাকিতে পারি ঐরূপ কোন স্থান একটু খোঁজ করিয়া দিলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিব। যদি ২।৫৲ খরচ লাগে, তাহাও ইনি দিতে রাজি আছেন।...আপনার চিঠি পাইলে আমি কলিকাতায় রওনা হইব।"

সুরমার কোন অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সমীচীন বোলে মনে হ'ল না, তা ছাড়া স্ত্রীকে চিঠির কথা জানাতে সাহস কর্লুম না। বড়দিনের বন্ধে একদিন না বোলে-কোয়ে সুরমা তার পাঁচমাসের কোলের ছেলেটিকে নিয়ে বিভাসের সঙ্গে আমার বাসায় এসে উপস্থিত। স্ত্রী রাগে ও ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ তাদের বেরিয়ে যেতে বল্‌লেন। মায়ের কোলে ঘুমন্ত শিশুর মুখ চেয়ে আমি স্ত্রীকে অনুরোধ কর্লুম ওদের দু'জনকে অন্তত একটি দিনের জন্য থাকতে দিতে, তিনি শুনলেন না কিছুতেই। আমি গোপনে তাদের একটা ধর্মশালার ঠিকানা দিয়ে দিলুম।

আন্দাজ দু' মাস পরে তাহের আলি নামে একজন মুসলমান যুবক আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করে। সে দার্জিলিংয়ে বিভাসের সঙ্গে এক অফিসে কাজ করে। দশদিনের ছুটি নিয়ে সবে কলকাতায় এসেছে সে। যুবকটি কথা-প্রসঙ্গে জানাল যে, সুরমাকে নিয়ে গিয়ে বিভাস প্রথমে সকলের কাছে নিজের বিবাহিতা বোন বোলে পরিচিত করে। শেষে একঘরে এক বিছানায় ওদের শুতে দেখে ও ওদের চালচলন দেখে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কর্মচারিদের স্ত্রীরা সন্দিহান হোয়ে ওঠেন। ওর ছেলে হওয়ার পর কথাটা ছোট সাহেবের কানে যায়। তিনি বিভাসকে জিজ্ঞাসা কোরে সুরমার স্বামীর যে নাম ও ঠিকানা পান্, সেই নামঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে দিন কয়েক বাদে

দেখলেন যে, "not known" মন্তব্য সহ চিঠিখানা ফেরৎ এল। তখন ছোটসাহেব বিভাসকে বলেন বড়দিনের বন্ধে সুরমাকে স্থানান্তরিত করতে এবং তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলার কৈফিয়ৎ দাবি করেন। ছোট সাহেবের হাতে-পায়ে ধোরে ব্যাপারটাকে তখনকার মতো সে চাপা দেওয়ায় এবং বড়দিনের ছুটিতে সুরমাকে কল্‌কাতায় আনে।

কলকাতায় কোথাও সুরমাকে রাখবার জায়গা না পেয়ে এবং নার্সিং শেখার বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কোন হোস্টেলে শিশু সমেত থাকার সুবিধা নেই দেখে তাদের দুজনকে নিয়ে বিভাস ওই মুসলমান বন্ধুটির গ্রামের দিকে রওনা হয়। বিভাস খ-য় কাজ করবার সময় এই মুসলমান যুবকটির গ্রামে দু'বার বেড়াতে গিয়েছিল। এর পিতা অনেক কাল মোক্তারি কোরে এখন অবসর নিয়ে দেশে বোসে জমিজমা দেখ্‌ছেন। তিনি মোটামুটি শিক্ষিত, উদার-ভাবাপন্ন, ধার্মিক ও অতিশয় অতিথিবৎসল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রটি অন্য জেলায় রেজিস্ট্রার, সেখানেই সে সস্ত্রীক বাস করে। মেজো ছেলে হল বিভাসের এই সহকর্মী যুবকটি; বছর চারেক হল বিয়ে করেচে, এখনো কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। ছোট ভাইটির তেইশ চব্বিশ বছর বয়েস, অবিবাহিত; ম্যাট্রিক ফেল কোরে বাড়িতে একরকম নিষ্কর্মা বসে আছে। এখন স্থানীয় লীগ্‌-কমিটিতে মোড়লি করে।

বিভাস আলিদের বাড়িতে সুরমা ও ছেলেটিকে রেখে ফিরে এল দার্জিলিংএ। ওই মুসলমান মোক্তার, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধুর অপরিসীম যত্নে সুরমা ও শিশু একরকম সুখে কাটাতে লাগ্‌ল। একদিন গভীর রাত্রে ছোট ভাইটি জন কয়েক স্থানীয় গুণ্ডার সাহায্য নিয়ে সুরমাকে বেঁধে গ্রামান্তরে নৌকা কোরে নিয়ে যায়; সে ও তার বন্ধুদের একজন একাধিকবার ওর ওপর বলাৎকার করে। শিশুটিকে বিভাসের বন্ধুপত্নীটি আদরযত্ন করতে থাকেন। ভূতপূর্ব মোক্তার সাহেব অবিলম্বে

জান্‌তে পারলেন তাঁর ছোটছেলের কুকীর্তির কথা; তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন এবং পুলিসে খবর দিয়ে তাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবেন বোলে ভয় দেখাবার ফলে চারদিন পরে সুরমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর সুরমা বিভাসকে চিঠিতে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা জানায় এবং দৃঢ়ভাবে লেখে যে, দশদিনের মধ্যে তাকে অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা না করলে, সে হয় বিষ খাবে নয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কোরে তাহেরের ছোট ভাই এর্সাদকে বিবাহ করবে। তাহেরের স্ত্রী খোকামণিকে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসে, কিছুদিনের জন্যে ওকে তার কাছে রেখে যেতে তার আপত্তি নেই। তাহেরের হাতে বিভাস পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছে এবং আমার সঙ্গে দেখা কোরে তাড়াতাড়ি একটা নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল ঠিক কোরে দিতে সানুনয় অনুরোধ জানিয়েছে।

দু'দিন ক্রমাগত অনুসন্ধান কোরে হাওড়া শহরে কোন পাড়ায় নার্সিং-শিক্ষানবীশ মেয়েদের একটা হোস্টেলে একটি সীট্ খালি পাওয়া গেল। সাতদিন পরে সুরমাকে তাহের সেইখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে দার্জিলিং ফিরে গেল। স্কুলে ভর্তি হ'ল সে মিস্ উর্মিলা চক্রবর্তী নামে। মাসদশেক পরে হোস্টেলের লেডি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের চিঠি পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে ও সুরমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট বল্লেন, ষষ্ঠ-মাসান্তিক পরীক্ষায় মিস্ উর্মিলা দশটাকা কোরে জলপানি ও স্কুলে ফ্রী স্টুডেণ্টশিপ পেয়েছে; আর গোটা পনের কোরে টাকা পেলে তবে হোস্টেলে তার থাকার খরচ চলে। কিন্তু মাস দেড়েক হ'ল দার্জিলিং থেকে তার দাদা মিঃ চক্রবর্তীর টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই থেকে উর্মিলা ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে; তার মাথা ধরছে, অসম্ভব অম্বল হচ্ছে, একটু একটু জ্বর হচ্ছে, রাত্রিতে মাথা আর পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে।

সুরমার ঘরে গিয়ে দেখলুম যে, সে আধখানা বিশীর্ণ দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ; অতি কষ্টে ক্ষীণ স্বরে কথা বেরুচ্ছে। সংক্ষেপে বল্ল, বিভাসের চাকরি গিয়েছে আজ দু'মাস, সে কোথায় চলে গেছে —তার কোন খবর নেই দু'মাস পরে ওর অন্তিম পরীক্ষা, কিন্তু যে অসুখে সে পড়েছে তাতে তার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না ; তার ওপর খরচ না দিতে পার্লে তাকে হোস্টেলে থাকতে দেবে না। আমি কুড়ি টাকা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের হাতে দিলুম এবং সুরমাকে বল্লুম যে, আর ২।৩ মাস তার সমস্ত খরচ চালাব। মেয়েটাকে দেখে সত্যিই দুঃখু হল, অমন ফুর্তিবাজ মেয়ে—কী হয়ে গেছে! তাকে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই জানালাম না।

দিন পনের পরে আর একদিন ওদের হোস্টেলে গিয়ে শুনলুম যে, সুরমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে শুনলুম যে, জরায়ুর কি-যেন একটা বিকৃতির জন্যে তার ওপর সেইদিন সকালে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, তার সঙ্গে ৪।৫ দিন দেখা করতে দেওয়া হবে না।....

মাসখানেক নানা কাজের চাপে আর সুরমার খবর নিতে পারিনি। পরে একদিন বিকেল বেলা হোস্টেলে গিয়ে শুনলুম যে, দিন পাঁচেক হ'ল মিস্ উর্মিলার সঙ্গে হাসপাতালের এক অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেনের বিয়ে হয়ে গেছে। গতকল্য তারা স্বামিস্ত্রীতে বিহারের কোন শহরে স্থায়িভাবে বাস করবার জন্যে যাত্রা করেছে!

তার পরদিন সুরমার মার কাছ থেকে চিঠি পেলুম,—দশ দিন আগে বিলাসপুরে মহিমবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন—সুরমাকে যেন খবরটা পৌছিয়ে দিই ; সে যেন অশৌচ পালন কোরে যথাসময়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ করে!

সপ্তম আলোচনা

আত্মীয়স্বজনের পাশবিকতা

পৃথিবীতে যত রকমের পবিত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটিই নারীকে নরকের দ্বারে পৌছাইয়া দিতে সাক্ষাৎ বা আসাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিয়াছে ও এখনো করিয়া থাকে। পিতামাতার কথা আপনাদিগকে ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি ও তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও দুর্বুদ্ধির দুই-একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজন ও স্বগ্রামবাসী যুবকদিগকে বাড়িতে পোষার পরিণাম কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে তাহারো আভাস ইতঃপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হইয়াছে। খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো, মাসতুতো ভাই-বোনে যে সকল সম্প্রদায়ে বিবাহের বিধি আছে, সেখানে উহাদের মধ্যে পূর্বরাগ সঞ্চারের সুবিধা ঘটে প্রচুর এবং পারস্পরিক প্রণয় ঘনীভূত হওয়ার লক্ষণ দেখিলে পিতামাতার দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে না। প্রাচীন মিশরে সহোদর ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহের প্রথা বহুকাল বর্তমান ছিল।

হিন্দু সমাজে সর্ব প্রদেশের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই cousinদের ভিতর পরিণয়ের রীতি আবহমান কাল হইতেই অপ্রচলিত ; সেইজন্য কোন পরিবারে এই সম্প্রদায়ের দুইজন তরুণ তরুণী cousin এর মধ্যে সাধারণত পূর্বরাগ সঞ্চার হয় না ; ক্বচিৎ হইলেও তাহা প্রকাশ পায় না বা বেশীদূর গড়ায় না। ক্বচিৎ গড়াইলে দুইজনে কলঙ্কের কালি গায়ে মাখে, বিবাহ করিতে পারে না। এমন চারিপাঁচটি কেস আমি জানি যেখানে দুইটি খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো অথবা মাসতুতো পিস্‌তুতো ভাইবোনে ইসলাম ধর্ম বা খৃষ্টধর্ম কবুল করিয়া উভয়ে পরিণয়সূত্রে

আবদ্ধ হইয়াছে। কোন দম্পতি তাহার পর স্বধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ আসে নাই। দক্ষিণ-ভারতে কোন কোন স্থলে কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মামাতো-পিস্‌তুতো ভাইবোনে অথবা মামা-ভাগ্নীর মধ্যে উদ্বাহ দোষাবহ বলিয়া গণ্য নয়। ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবারে এই প্রথা অত্যন্ত লোকপ্রিয়।

যশোহরের কোন শিক্ষিত আইনজীবী ভদ্রলোক তাঁহার পিতার খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন্ এবং খুড়ির নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পান্। ঘটনাকালে খুড়ির স্বামী বর্তমান ছিলেন, খুড়ির বয়সও যৌবনের পশ্চাদ্দ্বার অতিক্রম করে নাই। এই ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়; কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষই লজ্জিত বা দুঃখিত হন্ নাই। পরে তাঁহারা উভয়ে ধর্মান্তরিত হইয়া উভয়কে বিবাহ করেন এবং এখনো দাম্পত্য জীবন যাপন করিতেছেন। ইহা গেল পারস্পারিক সম্মতির কথা। তাহা ছাড়া ইহাকে নরনারী উভয়ের ইচ্ছাকৃত অধঃপতন বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিসহ হইলেও ইহার মধ্যে একটা আশ্বস্তিকর বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এই যে, উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিল—সে বিবাহ হিন্দুধর্মের দিক্ হইতে যতই আপত্তিকর বা গর্হিত বিবেচিত হউক না কেন। তদুপরি তাহারা দুঃখকষ্ট, দুর্নাম ও লোকাপবাদের মাঝখানে অটল থাকিয়া সুখে বহুবর্ষ একত্র বাস করিতেছে।

অনিচ্ছাকৃত আত্মদানের নিদান

যাহা হউক, নারীর অধঃপতন সকল সময়ে নিজের ইচ্ছায় হয় না—বিশেষভাবে যখন তাহারা অল্পবয়সী ও অপক্কবুদ্ধি থাকে। পুনরায় উল্লেখ না করিয়া পারি না যে, ইহাদের অধিকাংশের অধোগমনের মূলে থাকে পুরুষের প্রলোভন, প্ররোচনা, বলপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শন।

অনেক মেয়েই প্রথম চরিত্র হারায় না বুঝিয়া বা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া বা বাধ্য হইয়া—গৃহের কোন শিক্ষক, গোমস্তা, ভৃত্য, পাচক, দূর অথবা নিকট-সম্পর্কিতের নিকট। এইভাবে চরিত্রহারার সংখ্যা সত্যকার ভালবাসিয়া আত্মদানকারিণীদের সংখ্যা অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। আমাদের দেশে বরং কিছু বেশী বলিয়া আমার সন্দেহ—বিশেষভাবে পল্লীগ্রামে ও মফস্বল শহরে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে। বহুক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কীয় পশুপ্রকৃতির কাকা, মামা, জ্যেঠা, পিসেমহাশয়, মেশোমহাশয়—এমন কি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ দাদামহাশয় পর্যন্ত তাঁহাদের অন্নভোগিনী ও নির্ভরশীলা কিশোরী ও তরুণী কুমারী ও বিধবা আত্মীয়াদের ধর্মনাশ করিতে ইতস্তত করেন না।

মামা, কাকা, ভ্রাতা প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে যুবাবয়স্ক ও অবিবাহিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের প্রণয় প্রস্তাব মেয়েদের দিক হইতে প্রত্যুত্তরদায়ী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধের জন্য ও লোকলজ্জা ভয়ে তাহারা অধিকদূর অগ্রসর হয় না, প্রায়ই বুদ্ধিমতি মেয়েরা অগ্রবর্তিতার প্রলোভন দমন করে। আশ্রয়চ্যুতির ভয়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া ও কান্তপ্রেমের ছায়ামাত্রকে বুকের কোণে স্থান না দিয়া, অনেকে আত্মীয়দের নিকট আত্মদান করিয়া থাকে। এ সকল ঘটনা প্রতিবেশীদের কর্ণগোচর বা দৃষ্টিগোচর হয় কদাচিৎ, এমন কি গৃহস্বামী ও গৃহবাসিনীরাও বহুদিন এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন। এই সকল মেয়েদের কেহ কেহ অবৈধভাবে গর্ভিনী হইয়া সকল রহস্য বেফাঁস করিয়া ফেলে। তাহার পূর্বেই কেহ কেহ অন্য কোন মনোমত যুবককে ভালবাসিয়া আশ্রয়দাতার গৃহত্যাগ করে, কেহ কেহ গর্ভের প্রাক্কালে প্রতিপালকের করুণায় ও স্বার্থসঞ্জাত চেষ্টায় একটি স্বামী লাভ করিয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার অবসর পায়।

সুব্রতের দুষ্কৃতি

বৎসর তিনেক পূর্বে এই দেশেরই কোন শহরের আদালতে একটি কেস্ পুলিসের হাতে আসে। অধুনা পরলোকগত কোন বিখ্যাত ব্যারিস্টারের দুই ভাই ছিল, এখনও বোধ হয় ছোট ভাইটি জীবিত। ব্যারিস্টারের বড় ভাইটির একটি ছেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই সৈন্যদলে যোগ দেয়। তাহার নকল নাম দেওয়া যাক্ সুব্রত। যে রেজিমেণ্টে যুবকটি সাধারণ সৈনিক রূপে কাজ করিত, তাহা কর্মোপলক্ষে ইউরোপে প্রেরিত হয়। ঐ রেজিমেণ্ট ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে প্রায় তিন বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়া ছিল। ইতোমধ্যে সুব্রত সেকেণ্ড লেপ্‌টেন্যাণ্টের পদে উন্নীত হয় এবং বিলাতে সে একটি মধ্যবিত্ত পল্লী-গৃহস্থের মোটামুটি শিক্ষিতা ইংরাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বসে।

১৯৪৫ সালের শেষাশেষি কোন সময় পূর্বোক্ত রেজিমেণ্ট ভারতে প্রত্যাবর্তন করে। লেপ্‌টেন্যাণ্ট্ সুব্রতের ইংরাজ স্ত্রী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটীকে লইয়া তখনকার মতো বিলাতে থাকিয়া যায়। কথা থাকিল যে, জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসার একটু ভালো সুরাহা হইলে মহিলাটি তাহার শিশুকে লইয়া স্বামিগৃহে চলিয়া আসিবে। ১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে স্বামীর নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া জবাব অথবা খোরপোষের খরচ না পাইয়া, হঠাৎ মহিলাটি একদিন সকন্যা ভারতে চলিয়া আসে। স্বামীগৃহের অপ্রত্যাশিত ঔদাসীন্য, দৈন্য ও শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের আচার-ব্যবহার-ভাষাভঙ্গী দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া গেল। যাহা হউক, কোনমতে সে গৃহটীতে নিজের ও শিশুর ঠাঁই করিয়া লইল এবং নিজেকে নূতন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামী কিন্তু তাহার বিদেশিনী পত্নীর এই আকস্মিক আগমনকে প্রীতির চক্ষে দেখিল না। সে প্রথমে তাহাকে খুব এক চোট্ ভর্ৎসনা করিল, তারপর তাহার প্রতি কঠোর উদাসীনতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সে তাহার কাকার ম্যাট্রিক-পাস মেয়ে নতিকে বেল্‌জিয়াম্ ও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে তাহার স্বকপোলকল্পিত বীরত্বের লোমহর্ষণ কাহিনী ও ভয়চকিতা অপ্সরানিন্দিতা বিজাতীয়া তরুণীদের ব্যর্থ প্রেম-নিবেদনের মনোমদ ইতিহাস শুনাইয়া, মাঝে মাঝে চৌরিঙ্গীগড়ায় সিনেমা দেখাইয়া ও হোটেলে ডিনার খাওয়াইয়া একেবারে হাতের পুতুল করিয়া ফেলিয়াছিল। একদিন রাত্রিতে কোন হোটেলে নতিকে ডিনার খাওয়াইতে লইয়া গিয়া, পুনঃপুন উপরোধে কোণঠাসা করিয়া তাহাকে অর্ধ পেগ্ শ্যাম্পেন খাওয়াইয়া দেয়। তারপর সিনেমা দেখিয়া ফিরিবার পথে ট্যাক্সিতে তাহার সহিত অসঙ্গত আচরণ করে। নতির বাধা দিবার শক্তি যতখানি ছিল, ইচ্ছা হয়তো তদপেক্ষা কম ছিল।

ইহার পর সুব্রতের চাকরির মেয়াদ ফুরাইয়া যায়। একযোগে কিছু মোটা টাকা সে জঙ্গীবিভাগ হইতে লাভ করে। ইংরাজ পত্নীটি তাহার প্রতি ও শ্বশুরালয়ের প্রতি দুই মাসের মধ্যেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্বামীর সহিত ঝগড়াঝাঁটি করিয়া ও তাহাকে নালিশের ভয় দেখাইয়া ৪০০০৲ আদায় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে যুবকটি কাকীমা ও মায়ের প্রায় হাজার ছয়েক টাকার গহনাপত্র চুরি করিয়া নতিকে লইয়া শহর হইতে অন্তর্হিত হয়।

তিন মাস পরে তাহাদের দুইজনকে পশ্চিমের কোন স্বাস্থ্যকর স্থান হইতে কিছু বামাল সমেত উদ্ধার করিয়া আনা হয়। নতি বলে যে, তাহারা উভয়ে কোন শহরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া পরিণয়সূত্রে

আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে চায়। তাহার নেশা কাটিয়া গিয়াছে। সুব্রত তাহাকে তিন মাস কাল এক-প্রকার কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিত। একদিন কি একটা শোভাযাত্রা দেখিতে বারান্দায় বাহির হইয়াছিল বলিয়া সে তাহাকে প্রচণ্ড প্রহার করে। অথচ একদিন সে তাহার কোন জঙ্গী-বিভাগের কাপ্তেন বন্ধুর হঠাৎ সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং ঘোর অনিচ্ছা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও নতিকে একাধিকবার বন্ধুর নিকট দেহদানে বাধ্য করে।...

আদালতের বিচারে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য এবং ওই পাষণ্ড যুবকটির সম্ভবতঃ দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কেশবের কুকীর্তি-কাহিনী

বাংলা ১৩৩৯ সালের ফাল্গুনের ১লা তারিখে বেলেঘাটার কেশবচন্দ্র বসু নামক এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে আত্মীয়ার ধর্মনষ্ট করা, তাহাকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নগদে-অলঙ্কারে তাহার ১২৫০৲ আত্মসাৎ করার অভিযোগে শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত করা হয়। আত্মীয়াটির নাম কমলাবালা বসু, বয়স ১৮ বৎসর; মেয়েটি কেশবের নাতিদূর-সম্পর্কীয়া ভাগিনেয়ী।

আদালতে কমলাবালা যে সাক্ষ্য দেয়, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মর্মন্তুদ। সে বলে, "আমি খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার —র জমিদার প্র— দাসের কন্যা। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আমার মাতার মৃত্যু হয়। আসামী কেশব সম্পর্কে আমার মামা; সে আমার পিতার মৃত্যুর পর আমাকে ও আমার ভাইকে তাহার বেলেঘাটার বাসায় লইয়া আসে। কেশব মামা রমেশচন্দ্র বসু নামক একজন [illegible]লের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিল। রমেশ

বাবুর আর এক স্ত্রী ছিল বলিয়া সে আমাকে তাহার নিজের বাড়িতে রাখে নাই, আসামীর বাড়িতে আসিয়া আমার সহিত মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যাইত। আমার সহিত কেশবের কলহ হয়; এবং তাহার ফলে আমার স্বামী আমাকে লইয়া অপর বাড়িতে রাখিতে চাহে। কিন্তু আসামী আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না, অধিকন্তু স্বামীকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। দুই-তিন বৎসর পূর্বে এই ঘটনা ঘটে।

"ইহার কিছুদিন পরে আসামী কেশব আমাকে দিয়া আমার স্বামীর নামে একটি খোরপোষের মামলা দায়ের করায়। আমার স্বামী ১২০০৲ দিয়া মামলা মিটাইয়া লন্। এই মামলা মিটিবার মাস খানেক পরে আসামী একদিন আমাকে কালীঘাটে লইয়া যায়। কালীঘাটে যাইবার সময় আসামী আরো ২।৩ জন লোক সঙ্গে লয়। কালীঘাটে পৌঁছিয়া আসামী একখানা ঘর ভাড়া করে; আমি উহাদের জন্য রান্নাবান্না করি। ঐ দিন বৈকালে আসামী আমাকে সরবতের মত একটা-কিছু আনিয়া খাইতে দেয় এবং বলে যে উহা লেমনেড। আমি খাইয়া দেখি উহা মদ। আমাকে মদ খাওয়াইয়া রাত্রিকালে আসামী আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আমি ঐ সময় নেশার ঘোরে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ছিলাম; তদুপরি আসামী আমাকে শাসাইয়াছিল। সেই রাত্রিতেই আসামী আমাকে গাড়ি করিয়া বাড়ি লইয়া আসে।

"কয়েকদিন পর হইতে সে আমার নিকট বাহিরের অপরিচিত লোকদিগকে আনিয়া হাজির করিতে থাকে; তাহারা আমার দেহ জোর করিয়া উপভোগ করিয়া যাইত। ইহারা আমাকে কোন টাকা দিত না, আসামী উহাদের নিকট হইতে টাকা [illegible] করিত। কালীঘাটের ঘটনার প্রায় মাস খানেক বাদে সে আমার নিকট

ক্ষীরোদ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া বলে যে, সে খুব ধনী লোক এবং আমাকে অনেক কিছু দিবে সে। ক্ষীরোদকে নিয়মিত আমার কক্ষে আসিতে দিতে অনুরোধ করে, আমি তাহাতে অসম্মত হই। তিন-চারিদিন পরে আমি যখন আসামীর ছেলেমেয়ে লইয়া ঘুমাইতেছিলাম, তখন ক্ষীরোদ মাতাল অবস্থায় আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে এবং আমার উপর বলাৎকার করে। ঐ সময় আমি চীৎকার করিয়া উঠিলে আসামী তাহার হাত দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরে ও মারপিটের ভয় দেখায়। রাত্রি ৪টার সময় ক্ষীরোদ আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

"অতঃপর ক্ষীরোদ মাসে ৪।৫ বার করিয়া আমার নিকট আসিত। সে আমাকে ৬ গাছা সোনার চুড়ি ও ১টি আংটি দিয়াছিল, সে আসামীকেও টাকা দিত। অনুমান ৫ মাস ক্ষীরোদ এইভাবে যাতায়াত করিয়াছিল; ঐ সময় অন্য লোকেরাও আমার নিকট আসিত এবং তজ্জন্য আসামীকে টাকা দিত। আসামী আমাকে ৫।৬ বার বিভিন্ন বাগানে লইয়া গিয়াছে; তথায় আসামীর মক্কেলরা আমার দেহোপভোগ করিয়াছে। একবৎসর কাল এইভাবে চলিবার পর আমি গর্ভবতী হই। প্রসবের সময় আমি ১০দিন হাফরিন্ হাসপাতালে থাকি; তথায় আমার একটি পুত্র সন্তান হয়।

"হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বে আমি নগদ ৭৫০৲ ও আমার প্রায় সমস্ত গহনাপত্র আসামীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যাই। আসামী ও ক্ষীরোদ আমাকে হাসপাতাল হইতে লইয়া আসে। আসিবার সময় আসামী বলে যে, ছেলে লইয়া সে আমাকে বাড়িতে থাকিতে দিবে না, ইহাতে তাহার বদনাম হইবে। অগত্যা ছেলেটি ক্ষীরোদের হেফাজতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আমি মাসখানেক আসামীর গৃহে বাস করি। একদিন আসামী আসিয়া আমাকে বলে যে, পুলিস গোলযোগ

বাধাইয়া দিয়াছে, আমায় থানায় যাইতে হইবে। আমি থানায় গেলে, ক্ষীরোদ আমাকে ছেলেটি ফিরাইয়া দেয়। আমি সন্তান সহ আসামীর বাড়িতে ফিরিয়া আসিতে চাহিলে, আসামী আমাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।

আমি শিশুটিকে ছাড়িতে না চাওয়ায়, সে আমাকে উল্টাডিঙ্গির এক বেশ্যাবাড়িতে আমাকে একপ্রকার নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যায়। ৪ দিন পরে আমার ভ্রাতাকে একখানা পত্র লিখি, সে সন্ধান করিয়া বেশ্যালয় হইতে আমাকে উদ্ধার করে। আসামী আমাকে দিয়া ক্ষীরোদের নামেও একটা খোরপোষের মাম্‌লা রুজু করায়। ক্ষীরোদ ৩২৲ দিয়া ঐ মাম্‌লা রফা করিয়া ফেলে। আমার ভ্রাতা এই সকল ঘটনায় ম্রিয়মান হইয়া লোক-লজ্জার ভয়ে আত্মহত্যা করে। অতঃপর আমি আসামীর নিকট আমার গচ্ছিত টাকা ও গহনা ফেরৎ চাই। কিছুদিন টাল্‌বাহানা করিয়া, শেষে সে টাকা ও গহনার কথা অস্বীকার করিয়া আমাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়। আমি বর্তমানে আমার বাল্যশিক্ষক শ্রীনবকুমার আচার্যের বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছি।"

ক্ষীরোদ মণ্ডল, নবকুমার আচার্য ও পাড়াপ্রতিবেশীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য-সাবুদের বলে কমলার অভিযোগ ও উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কীর্তিমান কেশব দীর্ঘকালের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হয়।....

এই ঘটনার কথা শুনিয়া প্রত্যেক পাঠকপাঠিকারই মনে প্রশ্ন জাগিবে—অতঃপর কমলার কি হইল। সে প্রশ্নের উত্তর দানের অসামর্থ্য আমি সক্ষোভে ঘোষণা করিতেছি। ঔপন্যাসিক হইলে, তাহাকে হয় নবকুমারের সহিত বিবাহ দেওয়াইতেন, নতুবা পতিতালয়ে স্থান দেওয়াইতেন। কিন্তু নিরপরাধ শিশুটি কোথায় যাইত? এক্ষেত্রে কমলার জন্য একবিন্দু অশ্রু ফেলিয়া আমাদের

কর্তব্য শেষ করা ছাড়া আর উপায় নাই। এমন কত কমলা আছে, আমরা কয়জনে তাহার কয়টির খবর রাখি?

এই প্রসঙ্গে সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের দেশে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন স্তরে বহু কেশবও আত্মগোপন করিয়া আছে; ইহারা শব না হইলে সমাজের ঋদ্ধি ও শুদ্ধি সুদূরপরাহত।

—শেষ—